উ ন্ধা র
উ ন্ধা র
উ ন্ধা র
উ ন্ধা র
উ ন্ধা র
উ ন্ধা র
উ ন্ধা র
উ ন্ধা র
উ ন্ধা র

উদ্ধার

সমরেশ বসু

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৫৯ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সারকুলার রোড
হাওড়া-৪

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯।

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

এটি গোয়েন্দাকাহিনী নয়। কিন্তু অপরাধ ও রহস্য ভেদের বিষয়টি আপনার মনকে আকর্ষণ করতে পারে।

শ্রীসুভদ্র কুমার সেন
প্রীতিভাজনেষু

উদ্ধার

১

শনিবার রাত্রের পার্টি। সপ্তাহের মধ্যে এই একটাই তো দিন। মনের মতো বন্ধু, বন্ধুপত্নী দু-চারজনকে, অফিসের কোয়ার্টারে আমন্ত্রণ করে একটু পান-ভোজন। কিছু খোস-গল্প। অবিশ্যি সে-সব গল্পের অনেকখানিই কারখানা আর অফিসের কেচ্ছা। জগত বলতে তো একটাই—অফিস আর কারখানা। দৈবে, দু-চারটে ভিন্ন ধরনের কথা ছিটকে এসে পড়ে—যাকে বলে, আর্ট এ্যাণ্ড কালচার। তবে, সেটাও ঘটে, দৈবে যদি সে-রকম কেউ আমন্ত্রিতদের মধ্যে এসে পড়ে। যে মনে করে, সে একজন ইনটেলেকচুয়েল—সবাই ঠাট্টা করে, আঁতেল। আঁতলেমি আর মাতলামো এখানে একই পর্যায়ে পড়ে। বাদ বাকি সময়টা একটু পপ্ মিউজিকের রেকর্ড, তার সঙ্গে, কোমর দুলিয়ে কিছু নেত্য-কেত্য—ট্যুইস্ট এ্যাণ্ড শ্লেক। আধুনিকতার চরম বলতে পরের বউয়ের সঙ্গে হাত ধরে নাচা।

আমন্ত্রিত দম্পতীদের মধ্যে, বাইরের কেউ থাকে না। গঙ্গার ধারে, কারখানা চৌহদ্দির মধ্যে অন্যান্য কোয়ার্টারের অফিসার ব্যক্তিরাই। তবে বাছাবাছি আছে। যাকে বলে গ্রুপিং। সব গ্রুপের সঙ্গে, সকলের মেলে না। এ্যাড-মিনিস্ট্রেশন, এঞ্জিনীয়ারিং স্টাফের মধ্যেই প্রধানত ভাগাভাগি। বয়সটা কোনো ক্ষেত্রেই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। চরিত্র রুচি মর্জি মেজাজ, যার যেখানে খাপে খাপ মিলে যায়। অবিশ্যি অন্য কারখানার সম মর্যাদাসম্পন্ন অফিসার দম্পতীও যে নিমন্ত্রিত হয় না, এমন না। জগতটা তো একই। আসরটা একই, পরিবর্ধিত হয়ে ওঠে। অফিস আর কারখানার কেচ্ছার রঙ কিছু বদলায়। বিভিন্ন কোম্পানির কর্তা ব্যক্তি এবং তাদের স্ত্রী ও কন্যাদের চরিত্র নিয়ে রসালোচনার পরিধিটা বেড়ে ওঠে। তবে গ্রুপিংটা

ওয়েল মেইণ্টেণ্ড। নিজেদের গ্রুপের মধ্যেই, শনিবার রাত্রিটা, এক এক-জনের কোয়ার্টারে ভাগাভাগি হয়ে যায়। স্বাভাবিক। একজনের কোয়ার্টারে প্রত্যেক শনিবার পার্টি হতে পারে না।

আজ শনিবারের রাত্রের পার্টি হবে অতনু মুখার্জির কোয়ার্টারে। চটকল সাহেবদের সাবেক কালের কুঠি এখন কোয়ার্টার নামে চালু। কিন্তু এমন রাজকীয়, প্রশস্ত আর বিশেষ করে গঙ্গার ধারে বিশাল ইমারত, আজকাল আর দেখা যায় না। মরা হাতির দাম লাখ টাকার মতোই, এ সব-কোয়া-টারের চেহারা আলাদা। হাল আমলের মোজাইক টাইল্স-এর ঝলক, ছোট ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুম, দুটি বা বড় জোর তিনটি বেডরুম, যার গোটা পরিধি খুব বেশি হলে বিশ থেকে চব্বিশশো স্কোয়ার ফিট। চটকলের সাবেকি আর মজবুত ইমারতের, এক একটা কোয়ার্টারের লম্বা চওড়া ব্যালকনিই পনেরোশো ফুট ছাড়িয়ে যায়। মোজাইক টাইল্স-এর থেকেও, মেঝের লাল টকটকে রঙে, মাজা পালিশের আয়নায়, এখনও যেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। লাল রঙটা নিয়ে, যারাই যতো বাড়া-বাড়ি করুক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সেই লালের একটা ভিন্ন রূপ দিতে পেরেছিল। ঘরের ভিতর কার্পেট, সোফা, খাট বিছানা, সে সব অবিশ্যি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে যাচ্ছে। কিন্তু এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, ড্রইংরুমে ফায়ার প্লেস আজও সাহেবদের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে পড়ে আছে। সাহেবদের আমল চলে গিয়েছে। হয়তো বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বা তারও আগে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে তাদের ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলতো। তারপরে এসেছিল হিটারের যুগ। দিশি সাহেবরা শীতের দিনে বড় জোর ঘর গরম করার জন্য হিটার জ্বালে। কিন্তু ঘরে ঘরে এয়ার কুলারই এখন সব থেকে বেশি চলে। সামনের বিঘা বিঘা ছড়ানো বাগান, টেনিস লন, গঙ্গা—থুড়ি—হুগলী নদীর বাতাস সব উড়িয়ে নিলেও, ঘর ঠাণ্ডা হবার যন্ত্র না থাকলে, আমেজ আর আভিজাত্য, কোনোটাই বাড়ে না।

এখন অবিশ্যি শীত পড়ে গিয়েছে। তেমন জোর না হলেও, হেমন্তর শেষে, শীতের প্রথম আমেজটা আরামদায়ক বেশি। এয়ার কুলার চালাতে হয় না। ঘরের মধ্যে গায়ে চাপাতে হয় না গরম পোশাক। যদিও গরম পোশাকের চাকচিক্যের প্রতি একটা আলাদা লোভ আছে সকলেরই। মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে। কারণ, দেখাবার মতো পোশাক, বিশেষ করে পুরুষদের, শীতের মরসুমেই সুযোগটা বেশি। মেয়েদের আবার উলটো। যতোই হোক, তারা তো আর দশটা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের বউ না। তাদের পরিচয় মেমসাহেব। পোশাক দিয়ে যদি শরীরটাই আবৃত করে রাখতে হলো, তা হলে আর দেখাবার কী আছে। ব্রা-কাট ব্লাউজ, বুকের টিলার মাঝখানে বহতা ক্ষীণকায়া নদীর মতো আঁচল থেকে থেকে খসবে, শ্রোণীদেশের ওপরেই নাভিসহ অনেকখানি না দেখাতে পারলে, সবই মাটি। তা মেদবর্জিত হোক চাই না হোক, ভুঁড়ি নেমে গেলেও, মেদবহুলা নারীও সংক্ষিপ্ত বেশবাসে নিজেকে রঙ্গিনী করে তুলতে চায়। অতএব, মেমসাহেবরা যতোই দামী, সূক্ষ্ম কাজের রঙীন শাল জড়িয়ে আসুক, বিদেশী কোট, চোখ ঝলসানো উলের গারমেন্টস্ পরে আসুক, সে-সব একবার দেখিয়েই, সবাই আস্তে আস্তে ও সব জঞ্জালবৎ ত্যাগ করে, পুরুষদের সামনে শরীরটিকে তাজা ফুলের মতো মেলে ধরতেই উৎসুক। অবিশ্যি, কতোটা তাজা, আর কতোটাই বা শরীরের নিখুঁত বাঁধন গড়ন, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে চলে না। সকলেরই ধারণা, তারা এক একটি উর্বশী।

তবু অতনু মুখার্জিকে কাঁচের দরজাগুলো বন্ধ করে দিতেই হয়। মেম-সাহেবরা শরীর দেখাতে চাইলেও, শরীরের স্বাস্থ্যের আর বয়সের একটা ধর্ম তো আছে। নতুন শীতের আমেজ, সহজে রেহাই দিতে চায় না। তারপরে অবিশ্যি, পানীয়ের মাত্রা যতো বাড়তে থাকে, গরমও বাড়তে থাকে। তার সঙ্গে নানান্ গল্প হাসি উচ্ছ্বাস, মিউজিকের ঝংকার, নাচের

উন্মত্ততায়, শীতের আমেজ কোথায় পালিয়ে যায়। তখন ঘাম ঝরার পালা। তারপরে এক সময় যাবার পালা, এবং বিদায়। শনিবারের মধ্যরাত্রি তখন অতিক্রান্ত।

কলকারখানার সাহেব কুঠির শনিবারের পার্টির চেহারাটা এই রকম। এ সব হলো ঘরোয়া পার্টি। এ ছাড়া ক্লাব আছে। কিন্তু সবাই ক্লাবের ভক্ত নয়। সেখানে গ্রুপ মেইন্টেন করা যায় না। ইচ্ছা করলেও না। গ্রুপের মধ্যে অনাহুত, অপ্রার্থিতরা ঢুকে পড়ে। মেজাজ নষ্ট হয়। ঘরোয়া পার্টির তুলনায় ক্লাব হলো হাটের হট্টমালা। প্রাণ খুলে কথা বলা যায় না, মেলামেশাও অসুবিধা। মেয়েদের নিয়ে টানাটানি, মেজাজ কেবল গরমই করে না, হাতাহাতির পর্যায়েও চলে যায়। পেটে বস্তু পড়লে, সমাজ-সামাজিকতার খিল কজাগুলো বেবাক খুলে যায়।

এদের যদি আপস্টার্স্ট বলা যায় তা হলেও মনের মধ্যে উঁকি দিলে, সেই চিরন্তন রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত সত্তাটি বেরিয়ে পড়ে। অতনু আর তার বন্ধুরা অভিজ্ঞতা থেকেই নিজদের গ্রুপ নিয়ে, ঘরোয়া পার্টি করে। এখানেও সব কিছু নিতান্ত নিরামিষ না। অর্থাৎ, যে পাঁচ সাত জোড়া দম্পতী আসে, তাদের স্ত্রীদের নিয়েও নিজেদের মধ্যে রেষারেষি আছে। রেষারেষি আছে স্ত্রীদের মধ্যেও। আধুনিক হবার আপ্রাণ চেষ্টার মধ্যেও, প্রকৃতি আর প্রবৃত্তিকে ছাড়িয়ে ওঠা, এদের কারোর পক্ষেই সম্ভব না। তবে তাদের একটা সান্ত্বনা, নিজদের মধ্যে নাকি একটা ওয়েল আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং আছে। আসলে যা নেই। সবাই সবাইকে চেনে, বোঝে, অতএব চাপা-চাপিটা ভালো জানে। তবু কি আর কোনো দম্পতী বাড়ি ফিরে গিয়ে, নিজদের মুখোমুখি হয়ে ঝগড়া করে না? পরস্পরের ওপর রাগে আর ঘৃণায় খিস্তি-খেউড় করে না? এমন কি, হাতাহাতি কামড়া-কামড়ি পর্যন্ত হয় না? হয়, সবই হয়। আবার নিজেরা মানিয়েও নেয়।

না মানি

এই ছকের মধ্যে তারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এর বাইরে জীবন নেই। থাকলেও, তাদের পক্ষে সে ছকের বাইরে জীবন কাটানো, জলের মাছের ডাঙায় খাবি খাবার মতো। বাউল গান করে, 'মানুষ চলছে আজব কলে।' তার গানের অর্থ সে-ই জানে, ব্যাখ্যাও তারই আয়ত্তে। সেখানে দেহতত্ত্বের কথা। কিন্তু, এখানেও কথাটা খাটে, অন্য অর্থে। এরা চলছে আজব কলে। যদিও এরা জানে, কলটা মোটেই আজব না। এটাই বাস্তব আর সত্য। এদের জীবনদেবতা তার কারিগরিতে, এক আজব কলের নাটবল্টু করে এদের তৈরি করেছে। সেই কলেই এরা চলছে। অন্য দিকে তাকাবার অবকাশ নেই। ছকে না চলে উপায় কি?

২

রাত্রি আটটাকে, শনিবারে সন্ধ্যাই বলা চলে। অতনুর কার্পেট বিছানো আধুনিক আসবাব-পত্রে সাজানো ড্রয়িংরুমে আসর ইতিমধ্যেই জমজমাট। যাদের আসার, তারা সবাই উপস্থিত। সে নিজের হাতেই, প্রথম প্রস্থ পানীয় পরিবেশন করেছে। মহিলাদের কার কি পছন্দ, সে ভালোই জানে। তবু, কেতামাফিক একবার জিজ্ঞেস করে নিয়েছে, কার কি চাই। মহিলাদের মধ্যে অধিকাংশই বীয়র, ব্লাডি মেরী, জিন্ উইথ লাইম বা বিটার, এক আধজনের স্ট্রং এ্যালকোহলের প্রতি আসক্তি। অর্থাৎ হুইস্কি বা রাম। পুরুষরা সকলেই হুইস্কি রাম। কেউ কেউ অবিশ্যি মেয়েদের পানীয় নিয়েই খুশি। তবে এমন মহিলা পুরুষও আছে, যাদের কোনো রকম এ্যালকোহলই সহ্য হয় না। তবু, সপ্তাহের একটা সন্ধ্যায়, তারাও কিঞ্চিৎ এ্যালকোহলের স্বাদ নেয়।

অতনু মুখার্জি মাত্র কয়েক মাস আগে, অফিস মাস্টার থেকে সেল মাস্টারের পোস্টে প্রমোশন পেয়েছে। চটকলে এটা একটা বড় পোস্ট। অফিস মাস্টারের পোস্টও ছোট না। সেল মাস্টার তার থেকে বড়। রোজই প্রায় কলকাতার হেড অফিসে যেতে হয়। দায়িত্বপূর্ণ কাজ। রপ্তানির ব্যাপারে, কোম্পানি তার ওপরে নির্ভর করে। এক্সপোর্ট কোয়ালিটির মাল নিয়ে তাকে নানা রকম চিন্তা ভাবনা করতে হয়। বিদেশের বাজারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। কারখানায় মাল তৈরির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। তারপরে বিদেশীদের সঙ্গে কারবারে, লেন দেন ভাগ বাটোয়ারায়, সে তো আছেই। সেল মাস্টার মানেই, মাল বিক্রির প্রধান। কোম্পানির মাল কেনার ব্যাপারেও তার

হাত। বাঁ হাতের রোজগারটা ভালোই।

আজকাল অধিকাংশ চটকলের মালিকই মারোয়াড়ি, বা অন্য কোনো ভারতীয়। সাহেবদের আমলে যেমনটাই ঘটুক, হাল আমলে মালিকরা সেল মাস্টারের পোস্টে সাধারণতঃ নিজেদের নিকট আত্মীয়স্বজন ছাড়া বসাতে চায় না। সে-ক্ষেত্রে অতনু কোম্পানির যথেষ্ট বিশ্বাসভাজন। বয়স তার চল্লিশের নিচে। চেহারা ভালো। ভালো বলতে, মেদবর্জিত, ঋজু শক্ত না, বরং যাকে বলে লালটু মার্কা, সেই রকম। মোটামুটি লম্বা, চোখ মুখ মেয়েলি কোমল, একটু সাবেকি রোমান্টিক ফিল্ম হিরোর মতো। ঠাট্টা করে অবিশ্যি কেউ কেউ আলুভাতে বলে। কিন্তু অতনু স্মার্ট, চোখে মুখে কথা। ইংরেজিটা ভালো বলতে পারে। চোখে দীপ্তি আছে, বুদ্ধির ধার তেমন নেই। অথচ চাতুর্যের প্রখরতা বর্তমান—চালাক যাকে বলে। আর দোষের মধ্যে একটু চোখ পিট পিট করে। সেটা সকলের চোখে পড়ে না। কথাবার্তা চলাফেরায় ওটা ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু এমন না, চোখে তার দ্যুতি নেই। সে সব বোঝা যায়, যখন সে তার সাব-অর্ডিনেট-দের সঙ্গে গম্ভীর চালে কথা বলে, ধমকায়, বা কাজের ব্যাপারে লেকচার দেয়।

সংযুক্তা—অর্থাৎ মিলি যার ডাক নাম, অতনুর স্ত্রী, বয়স তিরিশের বেশি না। চার পাঁচ বছরের একটি মেয়ে আছে। কিন্তু মিলি সত্যি রূপসী। বলতে গেলে, ওদের গ্রুপের মধ্যে মিলি রূপসী শ্রেষ্ঠা। রঙ, নাক, চোখ মুখ, কিঞ্চিৎ দীর্ঘ শরীরের গঠন, অটুট উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, সব মিলিয়ে যেন একটি একুশ বছরের তাজা তরুণী। রূপসী বটে, কিন্তু রূপের প্রাখর্য নেই। বলা যায়, 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি'। হাসিটি মিষ্টি, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, এবং কালো তারা যুগলে দীঘির গভীরতা। উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে ওর প্রসাধনই সর্বাপেক্ষা অনুগ্র। কারণটা ওর নিজের ঘরে, নিজে হস্টেস বলে না, উগ্র প্রসাধন ওর বরাবরই অপছন্দ। হালকা ক্রিমে মাজা মুখ,

চোখে সরু টানের কাজল, ভুরুতে সামান্য পেন্সিল বোলানো, স্বাভাবিক লাল ঠোঁটে কিঞ্চিৎ রঙের স্পর্শ। এটাই ওর কাছে অনেকখানি। কিন্তু অতনুর কাছে না। প্রসাধন আর সাজগোজের উগ্রতা তার পছন্দ। এটা তার কাছে আধুনিকতার অঙ্গ। যেমন, মিলির ঘাড় ছাঁটা চুল। অতনুর ব্যগ্র ইচ্ছাতেই, ওর ঘন দীর্ঘ মোলায়েম কেশপাশ, কলকাতার মেম-সাহেবের কাঁচির গ্রাসে বিসর্জন গিয়েছে। ওর স্বাভাবিক ভুরুজোড়া সরুই ছিল। অতনুর ইচ্ছাতেই সরুতর করতে হয়েছে। শনিবারের সন্ধ্যায় বা অতনুর সঙ্গে বাইরে বেরোতে হলে, শাড়ি জামার আধুনিকতম ফ্যাশানটা বজায় রাখতে হয়। ফ্যাশানটার লক্ষ্য, বলা বাহুল্য, অঙ্গের আবরণকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা।

মেদবর্জিত ফরসা, সুগঠিত শরীরে, মিলির মসৃণ, উন্মুক্ত নাভিস্থল নিশ্চয়ই সুন্দর। কিন্তু নীবিবন্ধের বিলাসটা কেবল সামনেই না। পিঠের শিরদাঁড়া, নিতম্বের যেখানে গিয়ে মিশেছে, শাড়ির বন্ধনী তার কিঞ্চিৎ নিচে। নিতম্বের উন্নত অংশের সংকেতটা অবিশ্যিই দৃষ্ট হতে হবে। তেমনই, ব্রা-কাট জামাটির ভূমিকা একান্তই যেন অধরা। কোনো রকমে রঙীন আবরণে, দুটি শ্রীফল ধরে আছে, কিন্তু রাখতে বিষম দায়। অথচ, কুক্ষির কেশ উড়িয়ে দিতে ওর ঘোর আপত্তি, অতএব নিমছাট কেশ চোখে না পড়ে যায় না। মিলি মনে মনে লজ্জা বোধ করে, বাইরে সেটা বিসর্জন দিয়েছে। ও জানে, অনেকের কাছে এটা যৌন আবেদন ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু সেই অনেকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, অকারণ লোশন ব্যবহার করে, চামড়ার দৃষ্টিকটু কাল্‌চে রঙে, অন্য রঙ চাপানো আরও খারাপ লাগে।

অতনু অবিশ্যি অনেক রকমে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। মিলি বুঝতে চায় নি। তবু অতনুর আধুনিকতার ধাক্কায়, ওকে ব্লাডি মেরীর পাত্রে চুমুক দিতেই হয়। মদ্যপান নিয়ে অশান্তি অনেক হয়েছে। এখন মিলি এক পাত্র পানীয় নিয়ে পার্টির গোটা সময়টা কাটিয়ে দিতে শিখেছে। সিগারেটটা

ঠোঁটে চাপতে পারে নি কোনো দিনই। এক পাত্র ব্রান্ডি মেরীর স্বাদ যদিও বা কয়েক ঘণ্টায় সহ্য করে নিয়েছে, সিগারেটের ধোঁয়ার কটু স্বাদ ওর জিভটাকেই বিস্বাদ করে দেয়। সংস্কারের দ্বিধা এক্ষেত্রে থাকবার কথা নয়, নেইও। কিন্তু নিজের সব উপভোগটাই ছেড়ে দিতে হবে কেন? অথচ ও জানে, অতনু আদৌ চায় না, মিলি নেশা করতে শিখুক। সবটাই তো রীতি রক্ষা। সেটাই বাঁচোয়া। আর মিলি যদি সত্যি সত্যি মদ আর সিগরেটের নেশা করতো, অতনুই আগে ওকে বাইরের দরজা দেখিয়ে দিতো। সেটাও বাঁচোয়া, মিলির কোনো নেশা নেই। বই পড়াটাকে যদি নেশা বলা যায়, সেটা ওর আছে। গল্প উপন্যাসের থেকে ইতিহাস আর ভ্রমণ সাহিত্যই ওর প্রিয়। আর, অবাক কাণ্ড হলেও, কবিতা পড়তে ভালোবাসে। ওর বাবা ছিলেন ইস্কুল মাস্টার। ওর চোখে বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে এম. এ. পড়তে গিয়ে, বাবার সহসা মৃত্যুতেই পড়াশোনার অবসান ঘটেছিল। বই পড়ার নেশাটা ওর বাবার দান। কিন্তু এই চটকলের ক্লাব লাইব্রেরিতে আলমারি এখন প্রায় শূন্য। মাঝে মাঝে পোকায় কাটা, মনের মতো কিছু ইংরেজি বই হঠাৎ পাওয়া যায়। তাছাড়া শহরের একটা পুরনো লাইব্রেরি ওর ভরসা। সপ্তাহে এক বা দু'দিন ও লাইব্রেরিতে যায়। এই নেশাটা বাদ দিলে আর যা থাকে, তা হলো, সপ্তাহে একদিন এক মাত্র মদ, রঙ যার সুন্দর, স্বাদ সহ্য করার মতো প্রতিক্রিয়া বলতে গেলে শূন্য।

ভিতর আর বাইরের রহস্যটা সেখানেই।

বাইরের চোখে, অতনু মুখার্জি পোশাক-আশাকে আচার-আচরণে, যাকে বলে 'মড', পুরোপুরি তা-ই। আসল মডার্ন ম্যানের সংজ্ঞাটা যে কী, তা নিজেরও বোধহয় জানা নেই। মিলি জানে, স্বামীটি তার অন্তরে অতি-মাত্রায় রক্ষণশীল। ও যে মদ খেতে চায় না, সিগারেট আদৌ না, এতে অতনু মনে মনে খুশি। কিন্তু পার্টির আসরে তার মতো উদার আধুনিক

মানুষ আর হয় না। মিলি যে মাত্র এক পাত্র পানীয় নিয়ে সময় কাটিয়ে দেয়, সেজন্য যেন তার দুঃখের অন্ত নেই

অবিশ্যি এ কথা ঠিক, মিলি মদ স্পর্শ করতে, প্রথমে বিদ্রোহই করেছিল। যে কারণে এক সময়ে অনেক অশান্তি হয়েছে। তখন অতনুর আসল ইচ্ছাটা মিলি বুঝে উঠতে পারে নি। একটা অশুভ ভাবনা আর উদ্বেগ ওকে বিচলিত করে তুলেছিল। পরে অতনুর মনের আসল কথাটা বোঝা গিয়েছিল। অতনু নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছিল, সে আদৌ চায় না, তার বউ হবে মদ্যপায়ী। কিন্তু তার জীবন যাপনের একটা ছক আছে। মিলি সেই ছকের সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারলে, অতনুর সম্মান থাকে না। তার বউ পার্টিতে মদ স্পর্শ না করলে, সে জাতে উঠবে কেমন করে। মিলিকে তো সে রোজ মদ খেতে বলছে না। এমন কি পার্টিতে মদ খেয়ে অনেক মহিলার মতো র‍্যালা করতেও বলছে না। মাতাল মহিলাদের সম্পর্কে অতনু যে-সব বিশেষণ প্রয়োগ করে, তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ইতর উক্তি। অথচ সে নিজে মাতাল হয়ে, সেই সব মহিলার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

মিলির অশুভ ভাবনাটা ছিল আসলে অন্য রকম। আশঙ্কা করেছিল, অতনু ওকে একটি পাকা ফ্ল্যাট গার্ল করে তুলে, নিজের চাকরি আর চুরির সুবিধা করে নেবে। ওকে বাধ্য করবে কোম্পানির কর্তাদের খুশি করতে। সেই খুশি করার চেহারাটা যে কী, মিলি এই মিল কোয়ার্টারে এসে ভালো করেই জেনেছে। মুখে হরদম ইংরেজি বুলি, আর সাদা সাহেবদের ফেলে রেখে যাওয়া রদ্দি মার্কা সাহেবিপনার নকলনবিশীতে এরা যেন বাঁদর খেলার মতো হাত পাকিয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার আগে, মধ্যবিত্তের ঝোঁক ছিল স্বদেশীয়ানার দিকে। স্বাধীন হবার পরে এখন সাহেবিয়ানার ঝোঁক বেড়েছে। শহর আর শিল্পাঞ্চলের মধ্যবিত্তদের মধ্যেই এর প্রকোপ বেশি। মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে, পুরনো বিলিতি কোম্পানিগুলোর

চাকরিজীবি মধ্যবিত্তদের। বিশেষ করে, যারা আছে মেকানিক্যাল, টেকনি-ক্যাল বা এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের উচ্চপদে। তার সঙ্গে এরা অনেকেই যেটা খুইয়েছে, তা হলো চরিত্র। চাকরি বজায় রাখতে আর চোরাই পথের রোজগারের রাস্তা সাফ রাখার জন্য পারে না এমন কোনো কাজ নেই। সাহেবদের জায়গায় কর্তৃপক্ষ এখন মারোয়াড়ি, কোথাও কিছু সিন্ধি, কিঞ্চিৎ পাঞ্জাবী। তারা এই সব কর্মচারীদের দুর্বল ছিদ্রগুলো ভালো চেনে। অথচ এদের একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। অতএব চুরিতে ভাগ তো বসায়ই, উপরন্তু নিশ্চিন্তে চুরির পরোয়ানা দেবার জন্য, তাদের আরও কিছু দাবী থাকে। সেই দাবী মেটাতে, কেউ কেউ স্ত্রীকে উপঢৌকন দিতেও পিছপা না।

চটকলের রাজকীয় কোয়ার্টারে বাস করতে এসে মিলি এমন ঘটনাও দেখেছে। তা নিয়ে সকলেই ফিসফাস গুঞ্জন করে। নিজেদের মধ্যে কেচ্ছা করে, কিন্তু কেউ কেউ আবার সেই নিন্দনীয় মানুষটিকে ঈর্ষা করে। এমন কি, যে স্ত্রীটি অনায়াসেই ডিরেকটার বা ম্যানেজিং ডিরেকটারের সঙ্গে ব্যভিচার করে স্বামীর আয়ের পথ সুগম করেছে, অনেকের স্ত্রী তাকেও মনে করে ঈর্ষার পাত্রী। মিলির এই ভয়টাই ছিল। কিন্তু ওর স্বামী অতনুর লোভ যেমন আছে, রক্ষণশীলতাও আছে তেমনি। ভাগ্যিস ছিল। অতনু আর যাই করুক, স্ত্রীকে উপঢৌকন দিতে পারবে না। সেটা ওর চরিত্রের জোর না। রক্ষণশীলতা তো আছেই, তার সঙ্গে আছে বউ হারিয়ে বেহাল হবার ভয়। মধ্যবিত্তের মিথ্যা আত্মমর্যাদা বোধ। অনেকটা সাধু চোরের মতো। উচ্চপদ, প্রমোশন আর চুরির জন্য এতটা বেপরোয়া হবার সাহস অতনুর নেই।

তবে মিলির যদি তেমন ঝোঁক থাকতো, যেমন আজকের শনিবারের এই পার্টিরই কোনো কোনো মেয়ের আছে, তা হলে অতনু কতোটা শিরদাঁড়া সোজা রাখতে পারতো, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। লোভী মানুষের

শিরদাঁড়া, আর যাই হোক, কখনও তেমন শক্ত রাখা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে, সেই লোকের ধন যদি হয় চুরি। এবং অতনুর মতো লোকেরা চটকলের এমন পদে চাকরি করে, যেখানে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। চুরি এখানে অনিবার্য। না করলেই, অবাক আর অবিশ্বাস্য ব্যাপার। একঘরে হয়ে থাকার সাহসও কারোর নেই। সৎ থাকাও অসম্ভব। সমপর্যায় থেকে নিচের সারির সবাই চুরি করবে, আর একজন দাঁড়িয়ে দেখবে, এমনটা চলতে পারে না। হয় স্রোতে ভাসো, নয় তো ডাঙায় ওঠো। এই ডাঙায় উঠতে গেলেই শিরদাঁড়াটা শক্ত রাখতে হয়। সে-ভূমিকা আলাদা। সেই ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব নয়, যুদ্ধ লাগে তখন নিজেদের মধ্যে। কেননা এটা একটা পাতাল পথের নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। মুখে যতো খুশি সততার বুলি আওড়াও, আর বিদ্রোহী কথাবার্তা বলো, কিছু যায় আসে না। আগে হাত মেলাও। কে অকারণ এ সব বিরোধিতার মধ্যে যেতে চায়। তার থেকে হাত মেলানোই ভালো। হাতও ভরে, নিজেদের সংসারে সুখও থাকে। কিন্তু এরও একটা পরিণাম আছে।

কথায় বলে কচু কাটতে কাটতে হাত বলে যায়। অর্থাৎ হাত ক্রমে উচ্চমার্গে কাটতে শুরু করে। কচু কাটা থেকে, মানুষের গলা কাটা। অতএব, সব কিছুরই সীমা মেনে চলতে হয়। কিন্তু চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না। অতনুও নিশ্চয় এক সময়ে সৎ ছিল। তারপরে, যেখানকার যেমন চাল, সেই চালে পোক্ত হয়েছে। ফলে, শিরদাঁড়াটা ভিতরে ভিতরে দুর্বলই হতে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে মিলির কখনও তেমন ঝোঁক হয় নি, অতনুর শিরদাঁড়ার জোরটা পরীক্ষা করে দেখবে অতনুর জীবনের শরিক হয়ে, একদিক থেকে ওর নিজের শিরদাঁড়াটাও এমন কিছু শক্ত রাখতে পারে নি। ও কেবল মধ্যবিত্ত ঘরের সংস্কার নিয়ে আসে নি। ওর বাবার পাণ্ডিত্য আর বৈদগ্ধ মনে একটা আদর্শের রেখা এঁকে দিয়েছিল। যে-কারণে, অতনুর এই চাকরির চাকচিক্য ওকে মুগ্ধ করলেও, চুরি ছ্যাচড়ামি দেখে প্রথমে

বেশ ঠেক খেয়ে গিয়েছিল। বিরোধিতাও করেছিল। পরে বুঝেছিল, বিরোধিতা বৃথা। ওটাও চাকরির একটা অঙ্গ। অতএব মেনে নিয়েছিল।

এই রকম, চাকরির অঙ্গ হিসাবেই, মিলিকে অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়েছে। আপস্টার্ট হতে হলে, যা যা মানা দরকার। তবে সেখানেও, ওর বাবার নৈতিক বোধটা কোথাও ওকে লম্বা দড়ি ছাড়া, খুঁটির মতো বেঁধে রেখেছে। মদে মুখ দিয়েও, মাতাল হতে পারে নি। পার্টির হালচাল বুঝেও বেপরোয়া হতে পারে নি। আর মজলিসের নামে র‍্যালা করতেও আটকায়। পার্টিতে পুরুষরা কী চায়, সেটা ও ভালোই বোঝে। না বোঝার কোনো কারণ নেই। নিজের স্বামী অতনুকে দিয়েই সেটা বুঝতে পারে। যে-সব মহিলার সম্পর্কে অতনু উচ্চারণের অযোগ্য সব বিশেষণ ব্যবহার করে, মাতাল হয়ে তাদেরই জড়িয়ে ধরে, নাচের নামে এক ধরনের বিকৃত বেলেল্লাপনায় মেতে ওঠে। কিন্তু মিলির দিকে লক্ষ্য থাকে ঠিক। কারণ, অতনু তো খারাপ মহিলাদের সঙ্গে বেলেল্লাপনা করে। তার স্ত্রী সংযুক্তা মুখার্জি তো তা করতে পারে না!

মিলি মনে মনে হাসে। ওর এই হাসিটা করুণ, অথচ ব্যঙ্গে ভরা। ও যে অতনুর দৃষ্টি প্রহরার পরোয়া করে না, সেটা বেচারী জানে না। পরোয়া না করার অর্থ এই না, মিলির ও সব বেলেল্লাপনায় রুচি আছে। রুচি থাকলে ও ভিড়ে পড়তো। অতনুর উপায় ছিল না, মিলিকে রোখে। আসলে ওর ও সবে রুচি নেই, কিন্তু সকলের নেত্যকেও ও উপভোগ করে। তবু টানাটানি তো হয়। তখন ও ওর সাধ্য আর সীমা মতো, যোগ দেয়। গানের শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, সে-রকম ওর কিছু নেই। বস্তির থেকে মিনার চূড়ার বাঙালীরা যেমন সবাই কিছু কিঞ্চিৎ রবীন্দ্র অতুল-প্রসাদ নজরুল সঙ্গীত না করে পারে না, ওরও সেই রকম ঝোঁক আছে। পার্টির মেজাজ বুঝে মাঝে মাঝে গান শোনায়।

মিলি অতনুকে ভালোবাসে। নিজের চার বছরের মেয়েটিকে নিয়ে ওর

মনে স্নেহপূর্ণ সুখ আছে। বই পড়ার নেশা আছে। নিতান্ত পপ্‌ লিটারেচার না, দুপুরে পান চিবিয়ে, পাশ-বালিশে ঠ্যাঙ চড়িয়ে, যা গোগ্রাসে গিলতে পারা যায়। সীরিয়স লিটারেচর বলতে যা বোঝায়, সেদিকেই ওর ঝোঁক। আট দশ মাইল দূরে কলকাতায় শ্বশুর বাড়ি আর বাপের বাড়ির ভাবনা আছে। নিয়মিত সংবাদ না পেলে মন খারাপ হয়। সুযোগ পেলেই সেখানে ঘুরে আসে। শ্বশুর বাড়ি আর বাপের বাড়ি নিতান্তই সাধারণ মধ্যবিত্তের পরিবার। ছোটখাটো ভাড়াটে বাড়িতে, সেখানকার ছবিটা দরিদ্র। শ্বশুরমশাই রিটায়ার্ড্‌ পোস্ট মাস্টার। পেন্সন পান। অতনুর পরের ভাইটি চাকরি করে এক প্রাইভেট ফার্মে। বড় বোনের বিয়ে দিয়েছেন শ্বশুরমশাই নিজেই। এখনও একটি বিবাহযোগ্যা ননদ আছে। আছে কলেজে পড়া দেবর। এখানে তাদের যাতায়াতটা অতনুর পছন্দ না। তারাও এসে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। এবং একই ব্যাপার মিলির বাপের বাড়ির ক্ষেত্রেও। কারণ, এই মিল কোয়ার্টারের বর্ণ সংকর আভি-জাত্যের কাছে তারা বেমানান।

পুত্রবধূ হিসাবে মিলি, মাস গেলে শ্বশুরের হাতে টাকা দিয়ে আসতে দেরি করে না। মাসের প্রথমে অতনুকে সে-কথাটা মিলিকেই মনে করিয়ে দিতে হয়। ওর বাবা মারা গিয়েছেন। দাদা সরকারি জ্যেষ্ঠা কেরানী। তাঁর ওপরেই সংসারের দায়-দায়িত্ব। কিন্তু সেখানকার অভাব মেটাবার জন্য মিলি কখনও স্বামীর কাছে হাত পাতে না। দাদাও প্রত্যাশা করেন না। তবে বোনের প্রতি স্নেহের অভাব সেই কারণে ঘটে নি।

৩

এটা অনেকটা, নাটকের কুশীলবদের পরিচিতির মতো। অবশ্য গ্রীসিয়ান ক্লাসিকাল নাটকের মতো, এখানে ঘটনা প্রবাহের ধরতাই ধরিয়ে দেবার দরকার নেই। সেটা চাক্ষুষ করার বিষয়।

শনিবারের রাত্রি আটটায়, প্রথম রাউণ্ড শেষ করে, অতনু সবে দ্বিতীয় রাউণ্ড পরিবেশন করেছে বন্ধু আর বন্ধুপত্নীদের। যতীন অর্থাৎ অতনুর কুঠির কুক-কাম-সারভেণ্ট যতীনের হাতের মাছের ফ্রাই এসেছে টেবিলে। বাদাম, চানাচুর, পাঁপড় ভাজা আগে থেকেই ছিল। আসর বেশ জমে উঠেছে। মিলি নিজে উঠে, মাছের ফ্রাইয়ের প্লেট নিয়ে সকলের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। আলোচনার মুখ্য অংশ এখনও আঠারো ভাজার মতো, রাজনীতি, ফিলম্, সংবাদপত্রের আশ্চর্য সব স্টোরি, এবং আস্তে আস্তে অন্যান্য চটকলের অফিসার ও কর্তৃপক্ষের কেচ্ছার দিকে মোড় নিচ্ছে। অতনু রেকর্ড প্লেয়ারে রেকর্ড সাজিয়ে রাখছে।

এমন সময়ে কলিং বেল বেজে উঠলো। কথাবার্তা হাসির মধ্যেও শব্দটা অতনুর কানে গেল। কানে গেল মিলিরও। কিন্তু ব্যস্ত হবার কিছু নেই। যতীন অথবা ছায়া দরজা খুলতে যাবে। বিবাহিতা, কিন্তু স্বামী পরিত্যক্তা চব্বিশ বছরের ছায়া, আয়া-কাম্-মেড সারভেণ্ট। যতীন আর ছায়া সর্বক্ষণের কাজের লোক। যতীন থাকে সারভেণ্ট কোয়ার্টারে। ছায়া খালি ঘরের মেঝেয় শোয়। প্রায় দু' মিনিট পরে ছায়া এলো ঘরের দরজায়। মিলি এগিয়ে গেল তার কাছে। অতিথিরা সবাই এসে গিয়েছে। এখন কে আসতে পারে? অতনু শনিবারের সন্ধ্যায় কাজের ব্যাপারে কারোর সঙ্গে কোয়ার্টারে দেখা করে না। প্রায় প্রতি রবিবারেই, ম্যানেজারের অনুমতি

আর কোম্পানির গাড়ি নিয়ে কলকাতায় যায়। কারণ, অতনুর পদ হলো সর্বক্ষণের। বলে, কলকাতায় বাবা মাকে দেখতে যায়। আসলে, বাড়িতে একবার উঁকি দিয়ে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অড্ডা দিতে যায়। রাত্রে ফিরে আসে। সঙ্গে অবশ্য মিলিও যায়। চেষ্টা করে, শ্বশুর বাড়ি বা বাপের বাড়িতে সারাদিন কাটাতে। ছায়াকে গলা নামিয়ে, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'কে এসেছে?'

ছায়া বলল, 'চিনি না, কোনো দিন দেখি নি। মুখে গোঁফ দাড়ি, লম্বা মতন একটা লোক। বয়স বেশি না। দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'মিলের লোক নাকি?' মিলি জিজ্ঞেস করল।

ছায়া মাথা নেড়ে বলল, 'বুঝতে পারলাম না। কোনো দিন দেখি নি।'

মিলি নিজে যাবে কী না একবার ভাবল। মুখ ফিরিয়ে অতনুর দিকে তাকাল। অতনুও ওর দিকেই তাকিয়ে ছিল। এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'কে একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।' মিলি বলল, 'ছায়া চিনতে পারে নি।'

অতনুর হাতে গেলাস। শেষ শীতে বসন্তের আমেজ থাকলেও, গায়ে লাল রঙের হাফ হাতা, কলারওয়ালা উলের জামা। মিলির হাতে তৈরি। হুইস্কির প্রথম পেগের পর দ্বিতীয় পেগে সবে একটা চুমুক দিয়েছে। সবে কিঞ্চিৎ গোলাপী আমেজ দেখা দিয়েছে। তার মেয়েলি কোমল মুখে বিরক্তি দেখা দিল। চোখে ভ্রূকুটি করে বললো, 'আজ আবার এ সময়ে কে এলো? সবাই জানে শনিবার সন্ধ্যায় আমি কারোর সঙ্গে দেখা করি নে। মিলের মেকানিক্যাল কাজের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, যে ডিপার্টমেণ্টে ব্রেক ডাউন হলে আমাকে খবর দিতে হবে।'

'আমি দেখে আসব?' মিলি জিজ্ঞেস করল।

অতনুর মুখে বিরক্তির সঙ্গে ক্ষোভ দেখা দিল। বলল, 'বিরক্তিকর। তোমাকে

যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি। নিশ্চয়ই মিলের কেউ হবে, নইলে কোয়ার্টার কম্পাউণ্ডে ঢুকবে কেমন করে? আমি ভাগিয়ে দিয়ে আসছি। তুমি সকলের কাছে থাকো।'

অতনু গেলাসটা নিয়েই, লম্বা চওড়া বারান্দায় বেরিয়ে এলো। বারান্দা দিয়ে গঙ্গা দেখা যায়। সেখানেও মাঝখানে একটা বড় টেবিল আর গোটা কয়েক চেয়ার আছে। অতনু টেবিলের ওপর গেলাস রেখে, দরজার কাছে এগিয়ে গেল। মনে মনে অনুমান করার চেষ্টা করল, কে হতে পারে। ধমক দেবার জন্য তৈরি হয়েই, দরজা খুলল। কিন্তু ধমক দিতে পারল না। ভ্রূকুটি অবাক চোখে তাকিয়ে দেখল, অপরিচিত একজন দাঁড়িয়ে আছে। নীল ট্রাউজার দেখে মনে হলো কাপড়টা বিলিতি। গায়ে শীতের জামা নেই। সাদার ওপর খয়েরি ডোরা কাটা ফুল শার্ট, কোমরের বেল্ট বন্ধনীর ভিতরে গোঁজা। মেদবর্জিত লম্বা চেহারা, মাজা গায়ের রঙ। মুখে গোঁফ দাড়ি, তেমন বড় নয়। মনে হয় মাসখানেক কামায় নি। চওড়া কপালের ওপর উল্টে আঁচড়ানো, লম্বা চুল তেমন বিন্যস্ত নয়। চোখ দুটো বড়, নাকটা বেশ খাড়া। বয়স বোধহয় ছাব্বিশ সাতাশ হবে। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং নম্র। অতনুকে দেখেই দু' হাত কপালে ঠেকাল।

'কাকে চাই?' অতনু গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল।

আগন্তুক একটু হাসবার চেষ্টা করে, নম্র গম্ভীর স্বরে বলল, 'আপনাকেই। আমাকে বোধহয় স্যার চিনতে পারছেন না?'

সেই মুহূর্তেই যেন গঙ্গার দিক থেকে, আসন্ন বসন্তের একটা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগল। বুকের মধ্যে খেলে গেল বিদ্যুতের ঝিলিক। শির-দাঁড়ার কাছে কেমন একটা শিরশিরানি অনুভূত হলো। গোঁফ দাড়ির ভিতর থেকে, মাত্র একবার দেখা মুখটার আসল চেহারা ফুটে উঠল চোখের সামনে। বিরক্তির বদলে, হঠাৎ কেমন অস্বস্তি আর বিব্রত হয়ে বলে উঠল, 'আপনি! আপনি হঠাৎ এ সময়ে আমার কাছে?'

'আপনার সঙ্গে স্যার একটু কথা বলতে এসেছিলাম।' আগন্তুক কুণ্ঠিত হেসে, বিনীত সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল।

অতনুর বিব্রত অস্বস্তিভাব কেটে গিয়ে, মুখ শক্ত হয়ে উঠল। একটু ঝেঁজেই বলল, 'আমার সঙ্গে আপনার আবার কি কথা থাকতে পারে? সব তো চুকে-বুকেই গেছে।'

'তা গেছে।' আগন্তুক তৎক্ষণাৎ নম্রভাবে স্বীকার করল, 'সে-কথা নয় স্যার, অন্য একটা কথা বলতে এসেছিলাম, আপনি যদি কাইণ্ডলি একটু সময় দেন।'

অতনুর মুখ আরও শক্ত হলো। দৃষ্টি হলো কঠিন। বলল, 'শনিবারের রাত্রে আমি কারোর সঙ্গেই দেখা করি নে। বাড়িতে আমার গেস্টরা এসেছেন, এখন আমি ব্যস্ত আছি। আমার সঙ্গে আপনার কি কথা থাকতে পারে। ঝামেলা তো অনেক হয়েছে, মিটেও গেছে। আপনার অফিসের কর্তারা কিছু করতেই বাকি রাখে নি।'

'বললাম তো স্যার, আমি অন্য একটা কথা বলতে এসেছিলাম।' আগন্তুক অতনুর চোখের দিকে তাকিয়ে, অধিকতর নম্র স্বরে বলল, 'আসলে আমার অফিস বলতে আপাতত কিছু নেই। ভবিষ্যতে কী হবে জানি নে। পুলিশ আমাকে ইণ্টারোগেট করেছে। এখন ফার্দার ইনভেস্টিগেশন—!'

অতনু এ পর্যন্ত শুনেই অস্থির ভাবে মাথাটা জোরে নাড়াল। পুলিশ, ইণ্টারোগেট, ইনভেস্টিগেশন, শব্দগুলো যেন তার ভিতরে একটা সাপে ছোবলানো বিষের মতো ক্রিয়া করলো। বলল, 'না না, আমি এ সব শুনতে চাই না। এ সব শুনে আমার কী হবে? কী দরকার আমার শোনার? 'ইট ইজ ইওর বিজনেস, নট মাইন।' সে দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হলো।

আগন্তুকের চোখের দৃষ্টিতে হতাশা। মাথাটা নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল। অতনু একটা অস্পষ্ট শব্দে পিছন ফিরে তাকাল। মিলি অবাক জিজ্ঞাসু চোখ নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'ওই সেই—।' অতনু কথাটা শেষ না করে, দরজাটা আবার খুলল, বলল, 'এখন আমার ঘর ভরতি গেস্ট। আমার পক্ষে কোনো কথা শোনা সম্ভব নয়।'
মিলি এবার আগন্তুককে ভালো করে দেখতে পেল। এক পা এগিয়ে এসে অবাক হয়ে বলল, 'ও, আপনি সেই ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার?'
'হ্যাঁ, আমি সেই দুর্ভাগা অরূপ ঘোষাল।' আগন্তুক করুণ স্বরে বলল, 'আমি মিঃ মুখার্জিকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম, কিন্তু সেই ব্যাপারে কিছু নয়—'
অতনু অস্থির আর বিরক্ত হয়ে বলল, 'বললাম তো, এখন আমার পক্ষে কোনো কথা শোনা সম্ভব নয়। আপনি যে কথাই বলতে চান, সোমবার সকালে অফিসে এসে বলবেন।' বলেই এবার দরজাটা বন্ধ করে দিল।
কিন্তু অতনুর সেই গোলাপী নেশার আমেজ গিয়েছে ঘুচে! এইটুকু সময়ের মধ্যেই, তার চোখে উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। সন্ধ্যা রাত্রের জমে ওঠা পার্টির খুশি উজ্জ্বল মুখে নেমে এসেছে গাঢ় ছায়া। মিলি ভ্রূকুটি অবাক চোখে অতনুর মুখের দিকে দেখল। বলল, 'এতে তোমার আর চিন্তিত হবার কি আছে? সব তো প্রমাণই হয়ে গেছে। ছেলেটা সত্যি চুরি করেছে কি না, তুমিও জানো না আমরাও জানি না। কিন্তু ওর সঙ্গে সোমবার অফিসে কথা বলাটা কি ঠিক হবে? তোমাদের যা অফিস, হয়তো তা নিয়ে রঙ চড়িয়ে আবার গল্প রটিয়ে দেবে।'
অতনুর চোখ দুটো নতুন উদ্বেগে সচকিত হয়ে উঠল। বলল, 'ও, ঠিক বলেছ মিলি, ঠিক বলেছ। ওর সঙ্গে সবার সামনে অফিসে কথা বলা মানেই তাই।' বলে দরজাটা আবার তাড়াতাড়ি খুলে ফেলল।
অরূপ ঘোষাল সেখানে তখন দাঁড়িয়ে নেই। অতনু মুখ বাড়িয়ে দেখল, কাঠের সিঁড়ির ওপর পাতা চটের কার্পেটের ওপর ধীরে ধীরে পা ফেলে সে নেমে যাচ্ছে। অতনু ডাকল, 'এই যে, শুনুন।'

'কিন্তু কী বলবে তুমি ওকে ?' মিলি পিছন থেকে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল।

অতনু দেখল, অরূপ ওপর দিকে তাকিয়ে আবার উঠে আসছে। পিছন ফিরে বিভ্রান্ত মুখে জিজ্ঞেস করল, 'কী বলব বলো তো ?'

মিলি পিছন ফিরে একবার দেখে নিয়ে, অবাক হয়ে বলল, 'কী আশ্চর্য, তুমি এ রকম নার্ভাস হয়ে পড়ছ কেন ? তুমি তো কোনো অপরাধ কর নি। এখন ছেলেটার সঙ্গে তোমার কথা বলার অসুবিধে আছে। সোমবার দিন অফিসেও কথা বলতে যেও না। ওর কথা যদি শুনতে হয়, কাল শুনো। কাল কলকাতায় যেতে না হয় একটু দেরি হবে। কাল সকালে ওকে এখানে আসতে বল। তা ছাড়া, এখানে ও ঢুকলই বা কেমন করে ? এ রকম অচেনা লোককে দরোয়ান ঢুকতেই বা দিল কেন ?'

অরূপ এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। করুণ নত মুখ। অতনু বলল, 'শুনুন. সোমবার অফিসে কথা বলবার সময় হবে না। আপনার যা বলবার আছে, কাল সকাল আটটা নাগাদ এসে বলে যাবেন। কিন্তু মাইণ্ড ইট, সেই ব্যাঙ্কের ব্যাপারে কোনো কথা আমি আর শুনতে চাই নে।'

'আপনাকে তো বললাম স্যার, ও কথা বলতে আমি আসি নি।' অরূপ করুণ নম্র স্বরে বলল, একবার কুণ্ঠিত চোখে তাকাল মিলির দিকে।

মিলিই এবার বলল, 'ঠিক আছে. আপনি এখন যান, কাল সকালে ন'টা নাগাদ আসবেন, আটটায় নয়।'

অরূপ ঘোষাল যুবকটি দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'সত্যি আমি আপনাদের দুজনের কাছেই গ্রেটফুল। অসময়ে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা করবেন।' বলে আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

অতনু দরজাটা বন্ধ করল। মিলির ভ্রূকুটি চোখে বিস্ময়, বলল, 'তোমার মুখ দেখে আমি অবাক হচ্ছি। তোমার এত নার্ভাস হওয়ার কি আছে ? তুমি কি চুরি করেছ ?'

'কে বলেছে আমি চুরি করেছি?' অতনু অভিযোগের সুরে জিজ্ঞেস করল। মিলি হেসে উঠে বলল, 'তবে তুমি মুখটা অমন প্যাঁচার মতো করে আছ কেন। ছেলেটাকে দেখেই যেন নার্ভাস হয়ে গেছ! তোমার নার্ভাস হওয়ার কি আছে?'

'আমার নার্ভাস হবার কিছুই নেই।' অতনু নিজেকে বেশ খানিকটা সামলে নেবার চেষ্টা করল, বলল, 'কিন্তু এদের কী বিশ্বাস আছে, বল? কী মতলব নিয়ে হঠাৎ এতদিন বাদে আবার এসে হাজির হয়েছে, কে জানে?'

মিলি বলল, 'যে মতলবই নিয়ে আসুক, তাতে তোমার কি? ছেলেটাকে দেখেই তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ। অদ্ভুত লোক বাপু। যাও, ভেতরে যাও তাড়াতাড়ি। সবাই না জানি কী ভাবছে। তোমার গেলাস কোথায়?'

অতনু হঠাৎ মনে করতে পারল না, হুইস্কির গেলাসটা কোথায় রেখেছে। বলল. 'ঘরেই রেখে এসেছি।'

'মোটেই না। তুমি গেলাস হাতে করে বেরিয়ে এসেছিলে, আমি দেখেছি।' মিলি অবাক হয়ে বলল।

অতনুর চোখ পড়ল বারান্দার টেবিলের ওপর। বলে উঠল, 'ওহো, গেলাসটা ওই টেবিলে রেখেছি। তুমি এসো, আমি যাচ্ছি।'

মিলির চোখে কেমন একটা চিন্তিত অন্যমনস্কতা নেমে এলো। ভুরু কুঁচকে অতনুকে দেখল। অতনু ঘরে গিয়ে ঢুকল। মিলি একবার গঙ্গার দিকে তাকাল। দক্ষিণে গঙ্গা বাঁক নিয়েছে পশ্চিমে। তারপরে আবার পুবে, এবং দক্ষিণে। রাত্রের অন্ধকারে সেটা স্পষ্ট বোঝা যায় না। এপার ওপারের আলোর বিন্দুগুলি দেখে অনুমান করা যায়। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, ও ঘরে গিয়ে ঢুকল।

অতনু সকলের কাছে 'এ্যাপলজি' চেয়ে তাড়াতাড়ি থার্ড রাউণ্ড ড্রিংক সার্ভ করল। কারণ সকলেরই গেলাস শূন্য হয়ে গিয়েছিল। সবাই তার অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইছিল। সে বলল, 'আর বলবেন না, কোথা

থেকে একটা বাজে লোক এসেছে চাকরির খোঁজে। তাকে ভাগাতেই পারছিলাম না।'

একজন বললেন, 'এ রকম আনওয়াণ্টেড আননোন পাগলকে দবোয়ান ঢুকতে এ্যালাউ করল কেন? তার ওপরে আজ এই শনিবারের সন্ধ্যায়! গেটম্যানদের কাল ধমকে দেবেন।'

'নিশ্চয়ই দেব।' অতনু বলল, আর নিজের গেলাসে লম্বা চুমুক দিল। একজন মহিলা বললেন, 'এবার একটু মিউজিক হোক। অনেকক্ষণ বক্‌বক্ করা হয়েছে।' সবাই মহিলাকে হেসে, আওয়াজ করে সমর্থন করলেন। মিলি এগিয়ে গিয়ে, রেকর্ড প্লেয়ারের সুইচ অন করে, পিন নামিয়ে দিল। শুরু হয়ে গেল শ্বেক আর টুইস্ট। কিন্তু মিলি অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, অতনুর নাচে তেমন উৎসাহ নেই। সে তার নিজের গেলাসে আবার মদ ঢালছে।

সাড়ে এগারোটায় পার্টি যখন শেষ হলো, অতনু তখন মদের ঘোরে প্রায় অচেতন। একটা সোফার ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। সবাই বলল, 'মিঃ মুখার্জি আজ অনেকটা ড্রিংক করে ফেলেছেন। এতটা কোনো দিনই করেন না।

মিলি হেসে বলল, 'একটু বোধহয় বেশি মেরি মুডে ছিল।'

সবাই ঘাড় ঝাঁকিয়ে হাসল। সকলে মিলিকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিল। অতিথিরা চলে যাবার পরে, মিলি ঘরে ফিরে অতনুকে দেখল। ওর চোখে চিন্তিত বিস্ময়ের ঘোর লেগে আছে। অরূপ ঘোষাল ছেলেটাকে দেখার পর থেকে, অতনু আর যেন তেমন স্বাভাবিক হতে পারে নি। আজ অতনুর সেই হইচই নাচানাচি মাতামাতি ছিল না। কেবল বোতল থেকে হুইস্কি ঢেলেছে আর গিলেছে। খুব তাড়াতাড়ি মাতাল হয়ে পড়েছিল। কেন, হঠাৎ এমন ভাবান্তর কী জন্য?

মিলি অতনুর কাছে এগিয়ে গেল। মাথায় হাত দিয়ে ঝাঁকুনি দিল। হাত

ধরে টেনে ডাকল, 'এই, শুনছ, এই !'

অতনু মাথাটা তোলবার চেষ্টা করল, পারল না। মিলি মুখ নামিয়ে ডাকল, 'এই শোন, খাবে না ? কিছুই তো খাও নি। ওঠো, শুনছ ?' হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করল।

অতনু অন্য হাতটা ঝটকা দিয়ে, জড়িয়ে বলল, 'নো, আই স্যে, ইউ গেট আউট—গেট আউট ফ্রম মাই সাইট, ইউ গ্রেট ফ্রড !'

মিলি বুঝতে পারল, অতনুর মাথায় এখনও সেই অরূপ ঘোষাল ঢুকে বসে আছে। হেসে আরও জোরে অতনুর দু'কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকল, 'এই, কাকে গেট আউট আর গ্রেট ফ্রড বলছ ? শুনছ, এই। ওঠো।'

অতনুর কিঞ্চিৎ সাড়া ফিরে এলো। রক্ত চোখ মেলবার চেষ্টা করে জড়িয়ে বলল, 'আঁ, কী ? কী বলছ ?'

'বলছি, প্রচুর মদ গিলেছ। এবার একটু খাবার খেয়ে নাও।' মিলি স্বর চড়িয়ে বলল।

অতনু আবার ঢলে পড়ল, জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'না, খাব না, খিদে নেই। আমি ঘুমোব।'

'বেশ, ঘুমোবে তো শোবার ঘরে চল।' মিলি অতনুর হাত ধরে টানল। অতনু কোনো রকমে উঠে দাঁড়াল। মিলিকে ধরে টলতে টলতে, শোবার ঘরে গেল। বিরাট শোবার ঘর। আরও একটা শোবার ঘর আছে। সেটা ব্যবহৃত হয় না। ছায়া সেই ঘরের মেঝেয় শোয়। এ ঘরে অতনুর একটা সিঙ্গল খাট। মেয়েকে নিয়ে শোবার জন্য মিলির ডাবল খাট। মেয়ে মিউ সেই খাটে ঘুমোচ্ছিল। ছায়া দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের এক কোণে। মিলি অতনুকে খাটের কাছে নিয়ে যেতেই, সে ধপাস করে বিছানায় পড়ল। পা জোড়া এলিয়ে রইল খাটের বাইরে।

মিলি বিরক্ত স্বরে বলল, 'একদম বেহেড হয়ে গেছে। এখন আর জামা প্যান্ট ছাড়ানোও সম্ভব নয়। কেন যে এত খায় ?' বলতে বলতে অতনুর

পা দুটো খাটের ওপর তুলে দিল। ঠিক করে দিল মাথার বালিশ।

যতীন দরজায় এসে দাঁড়াল, বলল, 'সাহেব তো খান নি। আপনারও খাওয়া হয় নি।'

'সাহেব আর খেয়েছেন!' মিলি ব্যঙ্গ করে বলল, 'দেখে শুনে আমারও খেতে ইচ্ছে করছে না। তোমরা বরং খেয়ে নাওগে।'

ছায়া বলল, 'একেবারে উপোস দেবেন না বউদি। একটু যা হোক খেয়ে নিন।'

মিলি ঘুমন্ত মেয়ের দিকে একবার দেখল। তারপরে বাইরের ঘরের অন্য পাশে ডাইনিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'যা হয় সামান্য একটু দাও।'

৪

ভোরের আগে, প্রায় অন্ধকার থাকতেই অতনুর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙা না বলে, একে বোধহয় নেশার খোয়ারি কাটানোই বলে। মাথাটা কেমন টিপ টিপ করছে। শরীর জুড়ে অবসাদ। জিভটা ভারি আর মোটা লাগছে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার। অতনু কয়েক মিনিট চুপ করে শুয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে গতকাল রাত্রের কথা মনে পড়ল। পার্টি, মদ্যপান, ব্যাংকের অরূপ ঘোষাল—। এই পর্যন্ত মনে পড়তেই, সে উঠে বসল। শিরদাঁড়ার কাছে আবার সেই একটা শিরশির করে ওঠা ভাব। শরীরের সব গ্লানি উপছে মনে জেগে উঠল একটা উদ্বেগ। সে পাশে চোখ ফিরিয়ে, আবছা অন্ধকারে দেখতে পেল, বড় খাটে মিলি ঘুমোচ্ছে। মিউ—মেয়ে ওর বুকের কাছে গুটিশুটি ঘুমন্ত।

অতনু বসে থাকতে পারল না। খাট থেকে নামল। গায়ে সেই উলের জামা আর ট্রাউজার। বেজায় মাতাল হয়ে গিয়েছিল রাত্রে। মনে আছে অতনুর, অরূপ ঘোষাল ছেলেটাকে দেখার পরে ওর আর সে-মেজাজ ছিল না। ভিতরে এমন একটা অস্বস্তি আর উদ্বেগ বোধ করছিল, আর সেটাকে চাপা দেবার একমাত্র রাস্তা ছিল, তাড়াতাড়ি বেশ কিছু হুইস্কি টেনে আউট হয়ে যাওয়া। মিলি লক্ষ্য রেখেছিল কী না, অতনু জানে না। তবে অতিথিরা কিছু বুঝতে পারে নি। তারা ভেবেছিল, অতনু বেশ মেজাজে আছে। ঢালছে আর খাচ্ছে। আসলে অতনু আগে থেকে ভেবে রেখেছিল, অন্য একটা মিলের এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সুকান্ত সেনের স্ত্রী লালী সেনের সঙ্গে নাচবে। কিন্তু অরূপ ঘোষালের আবির্ভাবে, সব সখ আহ্লাদ সুখ মাটি হয়ে গিয়েছিল। লালী সেনের দিকে তাকিয়ে যেটুকু

নেশা জমছিল, বেবাক সাফ হয়ে গিয়েছিল।

অতনু রবারের স্যাণ্ডেল পায়ে, শব্দ না করে বাথরুমে গেল। দরজা বন্ধ করে বাতি জ্বেলে, বেসিনের সামনে আয়নায় মুখটা দেখল। বেশ খারাপ দেখাচ্ছে। নেশার ঘোরে ঘুমিয়েও, চোখের কোলে যেন কালি পড়েছে। সে টয়লেটের কাজ সেরে, চোখে মুখে ভালো করে জল ছিটিয়ে ধুয়ে নিল। ঘাড়েও জল দিল। তোয়ালে দিয়ে মুছে, বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। এখনই মিলিকে আর মেয়েকে জাগানোর কোনো দরকার নেই। ওরা ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। পোশাক বদলাতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু বদলাতে গেলেই মিলির ঘুম ভেঙে যাবে। এখন না বদলে, পরে বদলালেও চলবে।

অতনু বাইরের ঘরে এলো। কাঁচের পর্দা সরিয়ে, বারান্দার দিকে দেখল। গঙ্গার ওপর অস্পষ্ট ভোরের আলো। প্রদোষ যাকে বলে। সূর্যোদয় এখনও হয় নি। অতনু শব্দ না করে দরজার ছিটকিনি খুলে, বাইরের বারান্দায় গেল। বাইরের বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। তার বেশ আরাম লাগল। দরজা চেপে বন্ধ করে দিয়ে, গঙ্গার দিকে মুখ করে একটা চেয়ারে বসল। কিন্তু আরামটা স্থায়ী হলো না। অরূপ ঘোষালের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। তৎক্ষণাৎ শিরদাঁড়ার কাছে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। চোখে মুখে নেমে এলো উৎকণ্ঠার ছায়া।

এক মাস পরে গতকাল অরূপের আসাটা যেন একটা অশুভ অলৌকিক ঘটনার মতো। অপ্রত্যাশিত, অচিন্ত্যনীয়। অতনু একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল, ব্যাংকের ব্যাপারটা সব মিটে গিয়েছে। অবশ্য এখনও সে তাই মনে করে। কারণ অতনুকে সন্দেহ করার কিছু নেই। আর অরূপও গতকাল বলেছে, ও ব্যাংকের বিষয়ে কোনো কথা বলতে আসে নি। অন্য কথা বলতে চায়। খুবই সম্মান আর সমীহ করে কথা বলছিল অরূপ। চাকরিটা খুইয়েছে কী না, কে জানে। পুলিশ ওকে জিজ্ঞাসবাদ করেছে। এখনও তদন্ত চলছে। তার মানে, চাকরি না খোয়ালেও, নিশ্চয়ই সাসপেণ্ড

হয়ে আছে। আদৌ আর চাকরিটা ফিরে পাবে কী না সন্দেহ। সেই জন্যই বোধহয় দাড়ি গোঁফ কামায় না। অতনু প্রথমে চিনে উঠতে পারে নি। চিনতে যখন পেরেছিল, তখন ওর ভিতরে কেমন একটা আতঙ্কের শিহরণ অনুভূত হয়েছিল। এখনও যা হচ্ছে।

কিন্তু আতঙ্কের কোনো কারণ আছে কী? অতনু তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এক লক্ষ টাকার বাণ্ডিলটা যেখানে আছে, সেই জায়গাটা ওর চোখের সামনে ভাসছে। একশো টাকার এক হাজার নোটের বাণ্ডিল, খুবই খোলামেলা জায়গায়, অথচ অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থায় গোপনে রাখা আছে। অতনু ছাড়া, একটা কাক-পক্ষিও জানে না। মিলিকেও সে বলে নি। মেয়েদের সব কথা বলতে নেই। ওদের পেটে যে কেবল কথা থাকে না, তা নয়। ভয় পেয়ে কখন কী বলে ফেলবে, কিছু বলা যায় না। এই কোয়ার্টার যখন সার্চ হয়েছিল, মিলি তখন বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভয় অতনুও পেয়েছিল, সেটা অন্য কারণে। কোয়ার্টারে টাকা পাওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না। মিলের ম্যানেজার, আর ব্যাঙ্কের ইনভেস্টিগেটিং অফিসার, এরা অতনুর দিকে এমন তীক্ষ্ণ সন্দেহে তাকাচ্ছিল, আর বারে বারেই বলছিল, টাকাটা যদি তার হাতে এসে থাকে, সে সারেণ্ডার করে দিক। কেউ জানবে না, সম্মানও নষ্ট হবে না। চাকরিটাও থাকবে। তা না করে পরে যদি অতনু ধরা পড়ে, তা হলে তার সব কুলই যাবে।

মিলের ম্যানেজার আর ব্যাঙ্কের অফিসারদের সেই সব কথা শুনেই ওর মনে সংশয় আর ভয় হয়েছিল। কিন্তু অতনু একটুও মচকায় নি। নিজেকে খুব শক্ত রেখেছিল। বজায় রাখতে পেরেছিল, ওর সেই স্মার্টনেস্ আর হাসি। এমন কি মাঝে মাঝে বিরক্তিও প্রকাশ করেছিল, নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করার জন্যে। কিন্তু ব্যাঙ্কের অফিসাররা ওকে বিশ্বাস করতে পারে নি। বলেছিল, 'দেখুন মিঃ মুখার্জি, আপনাকে পেমেন্টের কুড়ি মিনিটের মধ্যে ধরা পড়ে একটা এক লাখ টাকার বাণ্ডিল কম। আপনাকে দেবার

কথা ছিল পাঁচ লাখ টাকা—পাঁচটা বাণ্ডিল। তার পরে, কুড়ি মিনিটের মধ্যে লাখ টাকার কোনো পেমেণ্ট হয় নি। বাণ্ডিল গুনতে গিয়ে দেখা গেল, একটা বাণ্ডিল কম। হয় তো লাখ টাকার বাণ্ডিল খোলার দরকার না হলে, ব্যাপারটা ধরা পড়তে আরও দেরি হতো। কুড়ি মিনিটের ব্যবধানে, সব ব্যাপারটা ঘটে গেছে। আমরা আপনার মিলে তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করি। আপনার জন্য মিলের ম্যানেজার অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু আপনি বন্দুকধারী দরোয়ানদের গাড়িতে বসিয়ে, মিলের গেট থেকেই কোয়ার্টারের কম্পাউণ্ডে চলে যান। এটা গাড়ির ড্রাইভার আর বন্দুকধারী পাহারাদার বলেছে। আমরা নিশ্চিত যে, পাঁচটা বাণ্ডিলের জায়গায়, ক্যাশ ক্লার্ক ছেলেটি আপনাকে ছ'টা বাণ্ডিল দিয়ে ফেলেছে! এ ছাড়া এক লাখ টাকার বাণ্ডিলটা আর কোথাও যেতে পারে না। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন।'

অতনু বেশ বিরক্ত হয়েই জবাব দিয়েছিল, 'আমি তো বলছিই, মিল কোয়ার্টার কম্পাউণ্ডে আমি ঢুকেছিলাম, কোয়ার্টারে যাবার জন্যেই। বাথরুমে যাবার দরকার ছিল। কিন্তু তাড়াতাড়িতে আমি আর তেতলায় আমার কোয়ার্টারে যাই নি। নিচে ক্লাবে ঢুকে পড়েছিলাম। আপনারা ক্লাবও সার্চ করেছেন। লাখ টাকার বাণ্ডিল নিয়ে আমি রাখব কোথায়? আর কেনই বা রাখব? আপনাদেরই কোথাও ভুল হয়েছে। আর তার বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন। গাড়ি থেকে নেমে আসবার সময় আমি যদি বাণ্ডিলটা নিয়ে আসতাম, সেটা কি দরোয়ানের চোখে পড়ত না?'

মিলের ম্যানেজার বলেছিলেন, 'সেটা ঠিক কথা। কিন্তু মিঃ মুখার্জি, বাথরুমে যাবার জন্য, আপনাকে কোয়ার্টারেই আসতে হয়েছিল কেন? অফিসেও তো ওটা সারতে পারতেন।'

অতনু বলেছিল, 'বড় বাথরুম স্যার, ওটা অফিসে সারা যায় না। সেই

জন্যই কোয়ার্টারে আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্লাব খোলা দেখে, সেখানেই ঢুকে পড়েছিলাম। তারপরে সোজা আপনার কাছে গেছি। আপনার সামনেই আমাদের পে-ক্লার্ককে ডেকে তার সামনে টাকা গোনা হয়েছে।'

অতনুকে কোনো দিক থেকেই কাবু করা যায় নি। সে নিশ্চিন্ত ছিল, টাকাটার বিষয় দরোয়ান বা ড্রাইভার কিছুই জানতে পারে নি। ব্যাঙ্কে ক্যাশিয়ারের নির্দেশে, অরূপ ঘোষাল যখন পাঁচটা বাণ্ডিলের জায়গায় ছ'টা বাণ্ডিল দিয়েছিল, তখনই অতনুর বুকের মধ্যে চমকে উঠেছিল। বাণ্ডিলগুলি ব্যাগের মধ্যে ভরতে ভরতে, ও ঘামছিল। অরূপের মুখের দিকে দেখছিল। অরূপ নিশ্চিন্ত হয়ে কিছু লিখে রাখছিল। আসলে সে ছ'টা বাণ্ডিলের হিসাব তখন টুকে রেখেছিল। এক মুহূর্তের ভুল। এক-জনের এক মুহূর্তের ভুলের জন্য, আর একজন এক মুহূর্তেই লাখপতি।

অতনুকে সন্দেহের অবকাশও কম ছিল। নিজের ডিপার্টমেন্টের অধস্তন কর্মচারীদের বেতনের টাকা সে-ই ব্যাঙ্ক থেকে নিয়মিত তুলে নিয়ে আসত। ব্যাঙ্কের সকলেই তাকে চিনত। ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই সাধারণত মিলে ফিরে আসা যায়। অবশ্য যদি রাস্তায় তেমন জ্যাম না থাকে। জ্যাম ছিল না। বন্দুকধারী দরোয়ান ড্রাইভারের পাশে সামনে বসে ছিল। টাকার ব্যাগ নিয়ে অতনু বসে ছিল পিছনে। ব্যাগ খুলে, একটা বাণ্ডিল সে সন্তর্পণে বের করে নিয়েছিল। ড্রাইভার বা দরোয়ান দেখতে পায় নি। অনায়াসেই জামার বোতাম খুলে, একেবারে কোমরের ভিতরে গুঁজে ফেলেছিল। কোটের বোতাম লাগাতেই, সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

সেই দিন বিকালেই অরূপ আর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এসেছিল। পরে আরও কয়েকজন অফিসার। তারা অরূপের লিখে রাখা নোটও দেখিয়েছিল, সে ছ'লাখ টাকার কথাই লিখেছে। কিন্তু দেবার কথা ছিল পাঁচ লাখ। সামান্য ভুল। অতনু স্বীকার করে নি। অফিসাররা অরূপের জন্য

করুণা চেয়েছিল। বেচারির চাকরিটা যাবে। অতনু শক্ত রেখেছিল নিজেকে। মনে মনে বলেছিল, 'ভুল করলে তাকে তার দাম দিতে হয়।'

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অফিসাররা রাত্রি বারোটা পর্যন্ত অতনুর কোয়ার্টারে ছিল। সব রকম সার্চ করেছিল। নানা রকম ভয় দেখিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মিলিকে দিয়ে আলাদা করে বলিয়েছিল। মিলিকে সে বিশ্বাস করাতে পেরেছিল, টাকাটা নেয় নি। ঘটনাটা নিয়ে মিলেও নানা রকম গুজব রটেছিল। এখনও গুঞ্জনটা একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। তবে প্রায় মরে এসেছে। এক মাস পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। অতনু কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে, সে আর বেতনের টাকা তুলতে, ব্যাঙ্কে যেতে চায় না। ম্যানেজার সেটা অনুমোদন করেছেন।

তারপরে হঠাৎ গতকাল রাত্রি আটটায় অরূপ ঘোষালের ভূতুড়ে আবির্ভাব! কোয়ার্টারের এই সুরক্ষিত এলাকায় ও ঢুকল কেমন করে? সচরাচর তো এমন হয় না। চেনা মুখ না হলে, দরোয়ানরা কারোকে ঢুকতে দেয় না। অবশ্য অনেক সময় দরোয়ানদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারলে, গেটের খাতায় নাম সই করিয়ে নিয়ে ঢুকতে দেয়। অরূপ বোধহয় সে-রকম ভাবেই ঢুকেছে। কিন্তু কী বলতে চায় সে?

'কখন উঠেছ?' পিছন থেকে মিলির গলা শোনা গেল।

অতনু চমকে পিছন ফিরে তাকাল। মিলি এগিয়ে এলো। ওর চোখে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা। অতনু বলল, 'এই একটু আগেই উঠেছি। মাথাটা কেমন টিপ টিপ করছিল। তাই বাইরে এসে বসেছি। তুমি ঘুমোচ্ছিলে বলে আর ডাকি নি।'

'তোমার কী হয়েছে বল তো?' মিলির স্বরে উদ্বেগ ও সংশয়, 'কাল সেই ছেলেটাকে দেখার পর থেকে তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ। পার্টিতে গুচ্ছের মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেলে। মাতাল তুমি হও, তা বলে ও-রকম আউট হয়ে যাওয়া, সকলে থাকতে থাকতেই—হোস্টের আর কোনো চৈতন্যই

নেই। কী ব্যাপার বল তো?'

অতনু মিলির চোখে চোখ রাখতে অস্বস্তি বোধ করল। মিলির চোখে সন্দেহ, দৃষ্টিটা যেন অতনুর চোখের ভিতরে ঢুকে বুকের মধ্যে হাতড়ে ফিরছে। মিলির ঘাড় ছাঁটা চুল এখন উসকো খুসকো, কপালে গালে এসে পড়েছে। ঠোঁটে বাসি রঙের দাগ এখনও অস্পষ্ট, এবং বাসি কাজলের দাগ চোখে। এখন সে নাইটি পরে আছে।

অতনু জবাব দেবার আগেই মিলের বাঁশি বেজে উঠল। তার মানে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। রবিবারেও মিল চালু থাকে। সপ্তাহের সব দিনই তিন শিফ্‌ট এমনিতেই চলে। রবিবারও বন্ধ থাকে না। চটকলের বসে থাকবার কোনো কারণ নেই। বিদেশের অর্ডার প্রচুর। বিশেষ করে রাশিয়া আর মধ্য প্রাচ্যে। পশ্চিমের অর্ডারও কিছু কম নেই। আমেরিকা ছাড়া ইউ-কে-র অর্ডার ভালোই।

অতনু বলল, 'তোমাকে তো বললামই, ব্যাপার কিছুই নয়। অরূপ ঘোষাল ছেলেটা আবার হঠাৎ এসে হাজির হলো কেন? ওদের আমি বিশ্বাস করি না। কে জানে, আবার কিছু গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করছে কী না?'

'কী গোলমাল পাকাবে? এক মাস পরে নতুন করে ওদের কী করার আছে?' মিলি যেন একটু বিরক্ত স্বরেই বলল, তা ছাড়া অরূপ ঘোষাল তো বলেই গেছে, সে ব্যাংকের ব্যাপারে কোনো কথা বলতে আসে নি। তুমি চুরিও কর নি, ডাকাতিও কর নি। শুধু শুধু এ রকম সাত সতেরো ভেবে মরছ কেন?'

অতনু নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে বলল, 'না, সাত সতেরো তেমন কিছু ভাবছি না। মাথাটা টিপটিপ করছিল বলেই বাইরে এসে বসে-ছিলাম। অবশ্য গতকাল রাত্রে ছেলেটাকে দেখে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছল।'

'অকারণ মেজাজ খারাপ করার কোনো মানে হয় না।' মিলি বলল,

'ছায়াকে চা করতে বলছি। চা খেয়ে বাথরুমে যাও। জামা প্যান্ট বদলে চান করে, কিছু খাবার খেয়ে নাও। কাল রাত্রে কিছুই খাও নি। খেয়ে যদি মনে হয় ঘুম পাচ্ছে, ঘণ্টা খানেক ঘুমিয়েও নিতে পারো। সেই ছেলেটাকে তো ন'টায় আসতে বলেছ ?'

অতনু বলল, 'হ্যাঁ।'

'এখনো অনেক সময় আছে।' মিলি বলল, যা বললাম, তাই কর। শরীরের গ্লানি কেটে যাবে, মাথা থেকে আজে-বাজে ভাবনাও চলে যাবে।'

অতনু উঠে দাঁড়াল। মিলির মনে কোনো সন্দেহ জাগাতে চায় না সে। যদিও অনেকবারই ভেবেছে, মিলিকে আসল ঘটনাটা বলেই ফেলবে। মিলিকে না বলার কি থাকতে পারে ? বলতে হলে একমাত্র মিলিকেই সব কথা ফাঁস করা যায়। এক লাখ টাকা ! সহজ কথা নয়। বলতে গেলে, ভাগ্য তাকে ঘটনাচক্রে টাকাটা হাতে তুলে দিয়েছে। সে চুরি করে নি। ভাগ্যের দানটা সে গোপন করেছে, স্বীকার করে নি। এটা কি খুবই একটা বড় অপরাধ ? এর থেকে অনেক বড় অপরাধ নিত্য দিন ঘটছে। সরকারী অফিস থেকে, এই চটকলে প্রতিদিন কতো রকমের চুরি হচ্ছে। সে নিজেও চুরির মধ্যে রয়েছে। জগতে সাধু ক'জন আছে। মিলের ট্রেড ইউনিয়ন লিডারদেরও মাসিক বরাদ্দ আছে। তা নইলে তো কারখানাই অচল হয়ে যাবে।

এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, অতনুর অপরাধটা কোথায় ? মনে মনে এ-রকম ভাবলেও, আশ্চর্যের কথা, যে-মিলি ওর সব থেকে আপন. তাকেও কিছুতেই কথাটা বলতে পারে নি। অনেকবার ভেবেছে, দুজনের কোনো এক ঘন সান্নিধ্যের মুহূর্তে কথাটা বলে ফেলবে। মিলির তো এ সংবাদে খুশি হবারই কথা। অতনু একলা টাকা দিয়ে কী করবে ? সে যা কিছু করছে, সবই তো মিলি আর মিউর জন্য। ভবিষ্যতে মিউর বিয়ে দিতে হবে। নিজেদের ভবিষ্যৎ আছে।

তবু বলতে পারে নি। ঘন সান্নিধ্যের আতপ্ত মুহূর্তে, কথাটা ঠোঁটে এসেও, উচ্চারণের ভয়ে, মিলিয়ে গিয়েছে। আসলে মিলিকেও ও মনে মনে ভয় পায়। অতন্তঃ এই লাখ টাকার ব্যাপারটায়, মিলিকেও ওর ভয়। ওর আশঙ্কা, মিলি কথাটা জানতে পারলে, একটা সাংঘাতিক কিছু করে বসবে। ওকে ঘৃণা করবে, অপমানে দুঃখে মাথাটাই হয়তো খারাপ হয়ে যাবে। মিলের সামান্য চুরির ব্যাপারেই প্রথমে যে-রকম ঘাড় বাঁকিয়ে উঠেছিল, অতনু চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। পরে অবশ্য ব্যাপারটা বুঝেছে। তবু, বোঝা যায়, ও-ব্যাপারে মিলির তেমন সায় নেই।

অতনু বাথরুমে বেসিনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাতে কামাতে ভাবল, মিলির এটা একটা ফলস্ আইডিয়ালিজেম্। এ সব আইডিয়া-লিজ্‌মের দিনকাল আর আছে নাকি? যারা আদর্শের বড় বড় বুলি আওড়ায়, তারা অঝোরে মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে, আর দু' হাতে পকেট ভরছে। অবশ্য ওর সহকর্মী অফিসাররা বলে, মিলে কী ঘটছে, না ঘটছে, সে-সব কথা স্ত্রীকে বলার দরকারটাই বা কী? তোমার কোথায় কি উপরি পাওনা হচ্ছে, তার হিসাব বউকে দেবার কোনো দরকার নেই। টাকা রোজগার করছ, করে যাও। খরচের টাকা বউয়ের হাতে ফেলে দাও। বাকি সব নিজের এক্তেজারিতে রাখ। বউ থাকবে বউয়ের মতো। তার চাহিদা মিটিয়ে দিলেই হলো। টাকা পয়সার হিসাব নিয়ে, তার সঙ্গে কথা বলবার দরকার কী? তুমি যদি সংসার চালাতে না পারো তখন কি বউ তোমার হিসাবের দায়দায়িত্ব নেবে? দায়দায়িত্ব সবই তো তোমার।

কথাগুলি খুবই খাঁটি, সন্দেহ নেই। কিন্তু অতনু গোড়া থেকেই, কেমন যেন সব ব্যাপারে মিলির হাত ধরা হয়ে গিয়েছে। মাইনের টাকাই হোক, আর এদিক ওদিক থেকে আসা টাকাই হোক, সবই সে বরাবর মিলির হাতে তুলে দিয়েছে। ছেলেবেলা থেকে বাবাকে যেমন দেখতো। বাবা মাইনেটি পেয়েই, মায়ের হাতে এনে তুলে দিতেন। মা হিসাব করে সংসার

চালাতেন। বাবা নিশ্চিন্ত মনে চাকরি করতেন। অবশ্য বাবার কোনো উপরি পাওনা ছিল না। অন্তত অতনু কখনও দেখে নি। পোস্টমাস্টারদের আর উপরি পাওনা—অর্থাৎ চুরি বা ঘুষের সুযোগই বা কি আছে? ইদানিং অবশ্য অনেক কথা শোনা যায়। মনি অর্ডারের টাকা নাকি পোস্টমাস্টাররা সুদে খাটায়। পোস্ট অফিসে ডিপজিটের টাকা তোলবার ব্যাপারে, অশিক্ষিত ডিপোজিটারদের নানা রকম ভাবে ঠকায়। কিন্তু সে সব অজ পাড়াগাঁয়ে সম্ভব হলেও হতে পারে। বাবা বরাবর আরবান অঞ্চলেই চাকরি করেছেন। বাবার কখনও সে-সব সুযোগ ছিল না। কিন্তু বাবার জীবন আর অতনুর জীবন এক নয়। মায়ের সঙ্গেও মিলির কোনো মিল নেই। বাবা আর মা, ও আব মিলি, আলাদা। তবু অতনু বাবার মতোই মিলির হাতে সব টাকা-পয়সা তুলে দেয়। দিয়ে নিশ্চিন্তও থাকে। মিলির নামেই ব্যাঙ্কে টাকা জমা থাকে। মাইনের হিসাবের বাইরের টাকা অবশ্য ব্যাঙ্কে জমা পড়ে না।

অতনু দাড়ি কামিয়ে একেবারে স্নান সেরে, জামা কাপড় বদলে নিল। এ বেলা কলকাতা যাবার জন্য গাড়ি চেয়ে রেখেছে। ন'টা নাগাদ অরূপ ঘোষাল এলো, কথা শেষ করে বেরোতে বেরোতে দশটা বাজবে। কী বলতে আসবে, কে জানে? দেখে বেশ দুঃখী মনে হচ্ছিল! সাহায্য-টাহায্য চাইবে নাকি?

গরম জলে চান করে, তেমন ঝরঝরে লাগছে না। শীত করছে। অতনু পায়জামা পাঞ্জাবির ওপরে একটা গরম চাদর জড়াল। মিলি তখন মিউকে মুখ ধুইয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে গিয়েছে। নিজেও মুখ ধুয়ে নিয়েছে আর একটা বেডরুমের সংলগ্ন বাথরুমে। যতীন এসেছে ভোর ছ'টাতেই। অতনু খাবার টেবিলে এসে বসল। কিন্তু আশ্চর্য, মিলির দিকে ও যেন ভালো করে তাকাতে পারছে না। গতকাল অরূপ ঘোষাল আসার পর থেকেই, এ-রকম হচ্ছে। এক মাসের মধ্যে কিছুই হয় নি। এখন মনে

হচ্ছে, সেই রাত্রেই মিলিকে কথাটা বলে ফেললে ভালো হতো। কিংবা ওর হাতেই টাকাটা তুলে দিলে, এখন আর মনে মনে এই অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তাটা থাকত না।

কিন্তু ভয়টা তো সেখানেই। মিলির হাতে টাকাটা তুলে দিলে, ও হয়তো ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের হাতে টাকাটা সমর্পণ করে দিত। বুঝত না, অতনুর একবার অস্বীকার করা মানে, যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। তখন টাকাটা ওদের দিয়ে দিলেও, অতনুর চাকরি নিয়ে টানাটানি হতো।

যতীন মিলির নির্দেশ মতো এক গেলাস কমলালেবুর রস দিল অতনুকে। তারপরে মাখন টোস্ট আর ডিমের পোচ। এক কাপ কফি। মিলি বলল, 'লেবুর রসটা খেয়ে নাও। কাল রাত্রে অনেক ড্রিংক করেছ। লেবুর রসটা খাওয়া দরকার।'

অতনু লেবুর রসে চুমুক দিয়ে ভাবল, দরকার তো অনেক কিছু। কিন্তু ঠিক নিজের দরকার মতো, জীবনের সব কিছু চলে কোথায়? কে ভেবেছিল অরূপ ঘোষাল হঠাৎ গতরাত্রে ওরকমভাবে এসে হাজির হবে? এখনও মনে হচ্ছে, এ যেন একটা ভৌতিক আবির্ভাব। অতনু খেতে খেতে লক্ষ্য করল না, মিউকে খাওয়াতে খাওয়াতে মিলি তাকেই দেখছে, আর মনে মনে সন্দিগ্ধ উৎকণ্ঠা বোধ করছে।

৫

অতনু ঘুমোয় নি। চোখ বুজে বিছানায় পড়ে ছিল। কলিং বেল বেজে উঠল। অতনু উঠে বসল। উৎকর্ণ হয়ে শুনল, বোধহয় যতীন বাইরের ঘর দিয়ে বারান্দার দিকে গেল। মিলি এসে ঘরে ঢুকল। হাতে খবরের কাগজ। বলল, 'বোধহয় অরূপ ঘোষাল এসেছে। ন'টা বেজেছে।'

'হ্যাঁ যাই, দেখি কী বলে।' অতনু চাদর জড়িয়ে খাট থেকে নামল, বলল, 'এ বুদ্ধিটা তুমি ভালো দিয়েছ। মিলে সোমবার ওর সঙ্গে দেখা করলে, অনেকে অনেক কিছু রটিয়ে দিত।'

মিলি বলল, 'তোমাদের কথাবার্তার মধ্যে আমি কি থাকব?'

'দরকার কি?' অতনু অনিচ্ছা প্রকাশ করল, 'সামনে যাবার দরকার নেই। সেটা ঠিক দেখাবে না।'

যতীন ঘরের দরজায় এসে বলল, 'অরূপ ঘোষাল নামে একজন এসেছে। আসবার নাকি কথা ছিল।'

'হ্যাঁ, ওকে বাইরের বারান্দায় বসতে বল।' মিলি বলল।

যতীন চলে গেল। অতনু মিলিকে বলল, 'তুমি বরং বাইরের ঘরের দরজার কাছে সোফায় বসো, কথাবার্তা সবই শুনতে পাবে। ও যদি ব্যাঙ্কের কথা তোলে, আমি এক কথায় ওকে দরজা দেখিয়ে দেব।'

মিলি বলল, 'দেখ, কী বলে। ছেলেটাকে দেখে আমার তেমন খারাপ মনে হয় নি। তবে কার মধ্যে কী আছে, কে বলতে পারে।'

অতনু মিলির চোখ থেকে চোখ সরিয়ে বাইরের ঘরে গেল। বাইরের ঘর থেকে বারান্দায়। অরূপ ঘোষাল সেই একই জামা আর ট্রাউজার পরে এসেছে। পায়ে জুতো মোজা। গত রাত্রের সঙ্গে কোনো তফাত নেই।

চেয়ারে বসে ছিল। অতনুকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল, দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'নমস্কার স্যার।'

'নমস্কার, বসুন।' অতনু ওর মুখে চেহারায় কথাবার্তায় খোলসটা বদলে নিতে চেষ্টা করল। অরূপের মুখোমুখি চেয়ারে বসে, প্রথমেই প্রায় পুলিশি কায়দায় জিজ্ঞেস করল, 'আগেই আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি এই কোয়ার্টারস্ কম্পাউণ্ডে ঢুকলেন কেমন করে? গেট-ম্যানরা আপনাকে আটকায় নি?'

অরূপ নম্র স্বরে, একটু বিব্রত হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আটকেছিল। আমি স্যার একটা মিথ্যে কথা বলেছি গেটম্যানদের।'

'মিথ্যে কথা?' অতনুর ভুরু কুঁচকে উঠল, 'কী মিথ্যে কথা বলেছেন?'

অতনুর হাসিমুখ অসহায় করুণ হয়ে উঠল, বলল, 'আপনি রাগ করবেন না স্যার, নিতান্ত বাধ্য হয়ে বলেছি, আপনি সম্পর্কে আমার দাদা হন। আমি কলকাতা থেকে এসেছি। তারা আমাকে বিশ্বাস করে, ভিজিটার্স খাতায় আপনার নাম লিখে আমার সই করিয়ে নিয়েছে। এই মিথ্যেটুকু না বললে, তারা আমাকে ঢুকতে দিত না, আমি আপনার কাছে আসতেও পারতাম না।'

'দিস ইজ ব্যাড।' অতনু তার সেল মাস্টারের ভঙ্গিতে বলল, 'আমি আপনার কথা ভেবে বলছি না। ধরুন যদি কোনো বাজে লোক, চোর ডাকাত এ রকম মিথ্যে কথা বলে কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ে, আর লুকিয়ে থেকে সময় মতো কোনো কোয়ার্টারে ঢুকে কিছু চুরি করে নিয়ে যায়, তখন কী হবে? গেটম্যানদের উচিত, ঠিক লোককে যাচাই করা।'

অরূপ মাথা নিচু করে স্বীকার করল, 'তা অবশ্য ঠিক।'

'সে কথা যাক।' অতনু ভারিক্কি চালে বলল, চেয়ারে নড়ে চড়ে বসল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কী বলতে এসেছেন বলুন।'

অরূপ মাথা নিচু করে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। অতনুর এই কয়েক

মুহূর্ত একটা রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগে কাটল। ঘরের ভিতর, কাচের দরজার পর্দা সরিয়ে, মিলিও এই দৃশ্য দেখছিল, এবং দুজনের কথাবার্তাই শুনতে পাচ্ছিল। অরূপ অসহায় করুণ মুখ তুলে, প্রায় ভেঙে পড়ার মতো বলল, 'স্যার, আমার জীবনে যা সর্বনাশ হবার, তা তো হয়েই গেছে। আপনি আমাকে একটা চাকরি যোগাড় করে দিন।'

'চাকরি!' অতনু যেন হতচকিত বিস্ময়ে উচ্চারণ করল।

অরূপ বলল, 'হ্যাঁ স্যার, আপনার মিলে যে কোনো রকম একটা চকরি। এম. কম্. পাশ করে বাবার দৌলতে ব্যাঙ্কের চাকরিটা পেয়েছিলাম, কিন্তু—।' অরূপের গলার স্বর ডুবে গেল। গোঁফ দাড়ির ভাঁজে চোয়াল কেঁপে উঠল। যেন সে উদ্গত কান্না সামলাচ্ছে। তার চোখের কোণেও যেন জল চিকচিক করে উঠল।

অতনু সাহায্যের কথা ভেবেছিল। চাকরি চাওয়ার কথা ভাবে নি। অরূপের দিকে তাকিয়ে ওর মনটাও একটু নরম হলো। গতকাল রাত্রি থেকে নানা রকম চিন্তায় ও যে একটা ভয় আর অস্বস্তিবোধ করছিল, সেটা অনেকখানি কেটে গেল। সত্যি, অরূপ ব্যাঙ্কের লাখ টাকার প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু বলতে আসে নি। নিতান্তই এটা চাকরি চাইতে এসেছে।

অরূপ নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আবার বলল, 'অবশ্য আমার কপালে কী আছে জানি নে। এখনো পুলিশ তদন্ত করছে, সেই রিপোর্টের ওপরেই আমার সবকিছু নির্ভর করছে। চাকরি চলে যেতে পারে, এমন কি জেলও হতে পারে।'

'আহা, আপনি এখনই এতটা হতাশ হয়ে পড়ছেন কেন?' অতনু সহানুভূতির স্বরে বলল, 'আপনি যা ভয় পাচ্ছেন, তার কোনোটাই না-ও ঘটতে পারে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই আপনার পাস্ড সার্ভিস রেকর্ড দেখবে?'

অরূপ বলল, 'তা হয়তো দেখবে। কিন্তু স্যার, আমার পাস্ড রেকর্ড আর কতোটুকু? মাত্র তো তিন বছর হলো চাকরিতে ঢুকেছি। বাবা মারা

গেছেন। আমি সংসারের বড় ছেলে। আমার পরের ভাইটিও কমার্সে এম. এ. পাশ করেছে, কিন্তু ব্যাঙ্কে ওর চাকরি হবে না। নিয়মানুযায়ী বাবা রিটায়ার করলে, ব্যাঙ্ক এক ছেলেকে চাকরি দেয়। তা ছাড়া আমার এই ঘটনার পরে, আর আমার ভাইকে কোনো ব্যাঙ্ক চাকরি দেবে না। দুটি বোন আছে, অবিবাহিতা। পড়াশোনা করছে। অনেক ভেবে, আপনার কাছে আসা মনস্থ করেছি।'

'হুঁ।' অতনু যেন চিন্তিত হয়ে পড়ল। আসলে, অরূপের এত সব পারিবারিক কথাবার্তা শুনতে তার মোটেই ভালো লাগছে না। সে বলল, 'চাকরির ব্যাপারটা আজকাল খুবই গোলমেলে হয়ে গেছে। এই ইউনিয়ন, আর ওয়ার্কস কমিটি হয়ে, আমাদেব হাতে কোনো ক্ষমতাই নেই। লিডারের সঙ্গে আমাদেরও মানিয়ে চলতে হয়। আপনার জন্য কিছু করতে হলে, আমাকে তাদেরই বলতে হবে—'

অতনুর কথা শেষ হবার আগেই, যতীন এক কাপ চা আর একটা প্লেটে কয়েকটা বিস্কুট এনে, অরূপের সামনে রাখল। অতনু অবাক হলেও বুঝল, এটা মিলির নির্দেশ। অরূপ ব্যস্ত অস্বস্তিতে বলল, 'আমাকে আবার চা কেন স্যার? আমি চা খেয়ে এসেছি।'

'তাতে কি হয়েছে, এক কাপ চা তো। খেয়ে নিন।' অতনু পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে মনে মনে মিলির প্রশংসা করল। এ সব বুদ্ধি মিলির খুব ভালো আছে। লাখ টাকার কথা তো দূরের কথা, ছেলেটা অতনুর সম্পর্কে আলাদা ধারণা নিয়ে যাবে। সে একটা সিগারেট ধরালো।

অরূপও কি এই রকম একটি ক্ষীণ অনুমান করল, অতনু মুখার্জির স্ত্রী শ্রীমতী সংযুক্তা মুখার্জি এই চা বিস্কুট পাঠিয়েছেন? অরূপ সংযুক্তা—অর্থাৎ মিলিকে দেখেছে। সেই অশুভ রাত্রে, যে-রাত্রে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সে এই কোয়ার্টারে এসেছিল। অরূপ মানুষ চেনে, এমন আত্মবিশ্বাস

তার নেই। কিন্তু অতনু মুখার্জির স্ত্রী মিলিকে দেখে মনে হয়েছিল, মহিলাকে বাইরে থেকে, যতোটা আপস্টার্ট আর মড দেখায়, কথাবার্তায় আচরণে অনেকটাই মধ্যবিত্ত সংসারের আটপৌরে সহজ আর স্বাভাবিক ভাব। ভঙ্গিসর্বস্ব নয়, বুদ্ধিমতী। আর সম্ভবত মনটাও ভালো। ও চায়ের কাপের দিকে, নম্র কৃতজ্ঞ চোখে তাকালো। চা দেখে, অতনুর চোখে চকিত বিস্ময়ের ঝিলিকই যেন জানিয়ে দিল, এটি তার পূর্ব নির্দেশ নয়। তা হলে সংযুক্তা মুখার্জি সামনের ঘরেই আছেন, হয় তো কথাবার্তা শুনছেন। অরূপ সচেতন হলো।

অতনু সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে বলল, 'কি হলো, চা খান।'

'এই যে খাই স্যার।' অরূপ একটা নিশ্বাস ফেলে, করুণ হাসল। বলল, 'ইউনিয়নের কথা যা বললেন, তা এখন সবখানেই। তবে ব্যাঙ্কে এখনো একটা নিয়ম আছে, বাবা রিটায়ার করলে এক ছেলে, বা দাদা বা অন্য কেউ অসময়ে মারা গেলে তার ভাই বোনের কোয়ালিফিকেশন থাকলে, একজনকে চাকরি দেবে। কত কাল এ নিয়ম চালু থাকবে, কে জানে। আমি বাবার রিটায়ারমেন্টের পরে চাকরিটা পেয়েছিলাম, তা সেটা—।'

অরূপ কথা শেষ করল না, যেন নিশ্বাসে আটকে গেল। এসব কথা শুনতে অতনুর মোটেই ভালো লাগছিল না। কিন্তু অরূপ ছেলেটার নম্র মার্জিত ব্যবহার, তার প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম দেখানো, এ সব দেখে মনটা নরম হয়ে যাচ্ছে। সে সিগারেটে টান দিয়ে বলল, 'অবশ্য ইউনিয়নের নেতাদেরও আমাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। ডিপার্টমেন্টের ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার-দের সঙ্গে কথা না বলে, লোক নেওয়া চলে না। আমার হাতে অবশ্য ডিপার্টমেন্টের চাকরির কোনো ব্যাপার নেই। আর ডিপার্টমেন্টেই চাকরির সুযোগ বেশি পাওয়া যায়। অফিসে খুবই কম।'

অতনুর কথা শেষ হবার আগেই, কলিং বেল বেজে উঠল। অতনু দরজার দিকে তাকাল। অরূপ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে ওঠবার উদ্যোগ করে

বলল, 'দেখব স্যার ?'

'আপনি বসুন, লোক আছে।' অতনু পিছন দিকে ফিরে তাকাল। আশা করা গিয়েছিল যতীন বা ছায়া আসবে। কিন্তু বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মিলি। অতনু বা অরূপের দিকে না তাকিয়ে সোজা দরজার কাছে চলে গেল। দরজা খুলে দেখা গেল, মিলের ড্রাইভার দাঁড়িয়ে। হাতে অর্ডার স্লিপ। মিলিকে দেখে সেলাম ঠুকল। মিলি হিন্দিতে বলল, 'ওহ্, তুমি এসে গেছ ?' পিছন ফিরে অতনুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'গাড়ি তো এসে গেছে। কখন বেরোতে পারবে ?'

অতনু হাতের ঘড়ি দেখল। দশটা বেজে গিয়েছে। তার চোখে মুখে অস্বস্তি দেখা দিল। বলল, 'এর সঙ্গে কথা হয়ে গেলেই বেরিয়ে পড়তে পারি।'

অরূপ বিব্রত অস্বস্তিতে বলে উঠল, 'আমার জন্য আপনাকে বসতে হবে না। আমি না হয় আর একদিন আসব।'

'তার আগে আপনি চাটুকু খান, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।' মিলি খুব সহজভাবেই অরূপকে বলল, এবং অতনুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা আর আধ ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে বেরোলেও ক্ষতি নেই, তাই না ?'

অতনু এখন অনেকটাই নিশ্চিন্ত, অরূপ ব্যাঙ্কের সেই লাখ টাকার ব্যাপারে কোনো কথা বলতে আসে নি। নিতান্তই চাকরির প্রত্যাশী হয়ে ওর কাছে এসেছে। সারারাত্রি মনে মনে যে উদ্বেগ বোধ করেছে, এমন কি অরূপ আসার আগে ও তার কথা শোনবার আগে পর্যন্ত, সেই উদ্বেগ দুশ্চিন্তা আর ছিল না। মিলির কথা শুনে বুঝতে পারল, আধ ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে বেরোবার ইচ্ছাটা ওরই। আপত্তি না করে বলল, 'তাই বলে দাও।'

মিলি ড্রাইভারকে জানিয়ে দিল। ড্রাইভার যাবার আগে, সেলাম ঠুকে বলে গেল, গাড়ি কুঠির সামনেই আছে। মিলি দরজা বন্ধ করে ফিরে

এলো। ঘরের মধ্যে না গিয়ে. ও সোজা বারান্দার টেবিলের সামনেই এলো। অরূপ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। অতনু যেন এটাও ঠিক প্রত্যাশা করে নি। কিন্তু মিলির এ আচরণ তার ভালোই লাগল। অরূপকে করুণা দেখাবার সুযোগ আর একটু বেশি পাওয়া যাবে। মিলির মনে কোনো খটকাও থাকবে না। বলল, 'মিলি, তুমি বোধহয় একে এখন চিনতে পারছ না। এর নাম অরূপ ঘোষাল, সেই ব্যাঙ্কের—।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনতে পারছি।' মিলি অরূপের দিকে তাকাল।

অরূপ সমীহ করে দু' হাত কপালে ঠেকাল। মিলিও প্রতিনমস্কার করে বলল, 'বসুন। আপনি চা খান, জুড়িয়ে জল হয়ে গেল যে!'

'তুমিও বস মিলি।' অতনু সিগারেটে টান দিয়ে বলল, 'অরূপবাবুর সঙ্গে আমার কোনো গোপন কথা হচ্ছে না। মিঃ ঘোষাল একটু অসুবিধেয় পড়ে আমার কাছে এসেছেন।'

মিলি সবই শুনেছিল। তবু বলল, 'সে সব পরে শুনছি, আগে উনি চায়ে চুমুক দিন।'

অরূপ নম্র কৃতজ্ঞ মুখে চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিল। মনে মনে ভাবল, এ রকমটাই সে চেয়েছিল। মিলি মুখার্জির সঙ্গে আলাপ করতে পারার অর্থ হলো, ওর ভবিষ্যতের পথ অনেকটা সুগম হয়ে ওঠা। মিলি অতনুর দিকে তাকাল। অতনু বলল, 'মিঃ ঘোষাল বলছেন, ব্যাঙ্কের চাকরিটা বোধহয় উনি আর পাবেন না।'

'আমাকে দয়া করে মিঃ ঘোষাল-টোষাল বলবেন না।' অরূপ বিনীত কুণ্ঠায় বলল. 'আমি সামান্য একজন মানুষ, বলতে পারেন ঘরে বাইরে সকলের কাছে করুণার পাত্র।'

মিলি বলল, 'সত্যি, মানুষের যে কখন কি হয়, কিছুই বলা যায় না। সেই লাখ টাকাটার আর কোনো কূলকিনারাই হলো না, না?'

অতনুর শিরদাঁড়ার কাছে কেমন একটা শিরশিরানি অনুভূত হলো। অস্বস্তি

আর অশান্তি বোধ করল। মিলি আবার সেই টাকার কথা তুলছে কেন? অরূপ অতনুর মুখের দিকে একবার দেখল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'ও কথা আর তুলবেন না। ওটা আমার রাতের দুঃস্বপ্ন, মনে হলে খেতে পর্যন্ত পারি না। কিন্তু দোষ তো আমারই। মিঃ মুখার্জিকে যে টাকাটা দেওয়া হয় নি, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাঙ্কে আমার সহকর্মীরাও যে সবাই একেবারে সৎ, তাই বা কে হলফ করে বলতে পারে? আমি আমার জীবনের এই একটা চ্যাপটার ভুলে যেতে চাই। নতুন করে জীবন শুরু করতে চাই। সেইজন্যই আমি মিঃ মুখার্জির কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছি। কারণ তিনি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারবেন।'

'কিন্তু ব্যাঙ্ক তো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, টাকাটা কোনো রকম ভাবে খোয়া গেছে।' মিলি বলল, 'কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি, আপনি টাকাটা নিয়েছেন। তবু কি আপনার চাকরিটা ফেরত দেওয়া হবে না?'

অতনুর অস্বস্তি বাড়তে লাগল। অরূপ করুণ বিব্রত মুখে হেসে বলল, 'প্রমাণ কিছু পাওয়া যাক বা না যাক, আমার হেফাজত থেকে যখন টাকাটা গেছে, তখন আমাকেই ফেরত দিতে হবে। এটাই নিয়ম।'

'কিন্তু এত টাকা আপনি ফেরত দেবেন কেমন করে?' মিলি সহজ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল।

অতনু অরূপের মুখের দিকে তাকাল। অরূপ বলল, 'যদি ব্যাঙ্ক আমাকে পুলিশি তদন্তের পরে চাকরি থেকে তাড়িয়ে না দেয়, তা হলে চাকরিতে বহাল করার শর্তই হবে, এক লাখ টাকা আমার মাইনে থেকে সুদসুদ্ধ ফেরত দিতে হবে। তবে চাকরি গেলেও যে আমি শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাব, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।'

'এ তো বড় সাংঘাতিক কথা!' মিলির আয়ত দু' চোখে উৎকণ্ঠিত বিস্ময় জেগে উঠল, বলল, 'কোনো প্রমাণ না পেলেও আপনার কাছ থেকে

টাকাটা আদায় করবে, না তো শাস্তি দেবে ?

অরূপ চোখ তুলে অতনুর দিকে একবার করুণ চোখে তাকাল। মাথা নিচু করে বলল, 'কাজের দায়িত্ব অস্বীকার করব কেমন করে বলুন। চাকরিরও একটা শর্ত আছে, তার থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না।'

মিলি আহত অসহায় বিস্ময়ে বলে উঠল, 'এ তো এক সাংঘাতিক অভিশাপ। অপরাধ না করে, সারা জীবন ধরে এই অপরাধের বোঝা বইতে হবে ?'

অরূপ কোনো কথা বলতে পারল না। মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। মিলি অতনুর দিকে তাকাল। অতনু অরূপকে বলল, 'এই যদি অবস্থা, তা হলে চটকলের কেরানীর চাকরি পেলেই বা আপনার কী সুরাহা হবে ?'

অরূপ নম্র বিষণ্ণ স্বরে বলল, 'সুরাহা স্যার একটাই হতে পারে। ব্যাঙ্ক যদি আমাকে চাকরিটা না দেয়, তা হলে যাতে টাকাটার শাস্তির জন্য জেলে না যেতে হয়, অন্য কোনো চাকরি করে আমি জীবনভর শোধ দিয়ে যেতে পারি, সেইটাই সুরাহা। তবু জানব, আমি জেলের বাইরে আছি। যে ভাবেই হোক টাকাটা শোধ দিচ্ছি।'

'ভয়াবহ !' মিলি প্রায় আর্তস্বরে বলে উঠল, 'আমি তো দেখছি, আপনার মতো একজন অল্পবয়সী ছেলের জীবন একেবারে লস্ট !'

অতনু আবার অস্বস্তি বোধ করল। কিন্তু অন্যমনস্ক চোখে গঙ্গার দিকে তাকাল। অরূপ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'সেই জন্যই এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি আর ভাবতে চাই না। ভেবে লাভ নেই, বরং আরো খারাপ লাগে। জীবনে অনেক আশাই ছিল। সে সব আমি ভুলে যেতে চাই। এখন শুধু চোর অপবাদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে সারাটা জীবন ধরে ঋণ শোধ করে যেতে হবে। সব থেকে খারাপ লাগে মায়ের মুখের দিকে তাকালে। দুটো বোন—।'

'আপনি কি বলবেন। আমি তো ভাবতেই পারছি না আপনার মায়ের

অবস্থা !' মিলির চোখে উৎকণ্ঠা তীব্র হয়ে উঠল, 'আপনার নিজের জীবন বলেও তো একটা কথা আছে। সখ, সাধ, আহ্লাদ...।'

অরূপ মাথা নিচু করে, ঘাড় নেড়ে বলল, 'ও সব আর ভাবি না। আপনি— কী বলব—আপনার কথা শুনে নিজের আপনজনের থেকেও বেশি মনে হচ্ছে। কিন্তু ভেবে কোনো লাভ নেই। আপনাদের শুধু শুধু ব্যস্ত করা ঠিক নয়।'

'ব্যস্ত আবার কি, এ তো মানুষ মাত্রেই বলবে ভাববে !' মিলির স্বরে গভীর সমবেদনা ফুটে উঠল, বলল, 'অবশ্য ঠিকই, আমরা হয়তো কিছুই করতে পারব না। কিন্তু ভাগ্যের এ কি পরিহাস ? অরূপবাবু, সত্যি কথা বলছি আপনাকে, আমার স্বামীকে সন্দেহ করে এক মাস আগে যখন ব্যাঙ্কের অফিসাররা আর পুলিশ আমাদের কোয়ার্টারে এসেছিল, আমার নিজের মনটাও সেদিন খচখচ করেছিল। এমন কি মিলের ম্যানেজার পর্যন্ত আমার স্বামীকে সন্দেহ করেছিলেন, যে কারণে—।'

অতনু তীব্র অস্বস্তিতে আর স্থির থাকতে পারল না। বলে উঠল, 'আহা, থাক না মিলি, সে সব পুরনো কথা তুলে আর কি লাভ ?'

'লাভ নেই জানি।' মিলি বলল, 'আমি অরূপবাবুকে আমার মনের কথাটা না বলে পারছি না। সত্যি, আমি আমার স্বামীকে পর্যন্ত সন্দেহ করেছি। ম্যানেজারের কথায়, ওর সঙ্গে আমি আলাদা কথা বলেছি, ওর হাত ধরে অনুনয় বিনয় করেছি, যদি ও সত্যি জানে, টাকাটা কোথায় আছে বা নিজেই নিয়ে থাকে। কেন বলেছি বলুন তো ? এই কারণেই তো, একজন সামান্য ভুলের জন্য সারা জীবন শাস্তির বোঝা বয়ে বেড়াবে ? কিন্তু আমি তো পরে বুঝেছি, আমার স্বামী নির্দোষ। আমার কাছে ও কখনো মিথ্যে কথা বলতে পারে না।'

অরূপ মিলির চোখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলি শুনছিল। তার গোঁফ দাড়ি ভরা মুখে ও চোখের গভীরে ছিল তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা। মিলির ভিতরটা

দেখতে চেষ্টা করছিল। সংসার ওকে এই বয়সেই, হঠাৎ একটি আঘাতে, অনেকখানি অভিজ্ঞ করে তুলেছে। ও বুঝতে পারছে, মিলির বাহ্যিক পোশাক-আশাক চাল-চলন যেমনই হোক, একটি খাঁটি মানুষ যেন তার মধ্যে রয়েছে। সে তার অন্তরের বিশ্বাস থেকেই অনুভব করেছে, তার স্বামী নির্দোষ। সেটা মিলির স্ত্রী জীবনের সামাবদ্ধতা হতে পারে। অতনুর এটাই বড় কৃতিত্ব, মিলিকে সে বিশ্বাস করাতে পেরেছে। মিলির কথা শুনতে শুনতে অরূপ দেখল, অতনু অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টায়, গঙ্গার দিকে তাকিয়ে, আবার একটা সিগারেট ধরাচ্ছে। কিন্তু তার হাত কি একটু কাঁপছে ?

অরূপ ব্যস্ত কুণ্ঠায় বলে উঠল, 'না না, এ কি বলছেন আপনি ? আমিও কি জানি না, মিঃ মুখার্জি কখনো মিথ্যে বলেন নি ? ওর তুলনায় আমি একটা সামান্য মানুষ, আমার জীবনটা উনি কেন নষ্ট করতে চাইবেন ? আমি সে কথা কখনো ভাবি নি। আপনাদের কাছে এভাবে আসতেও পারতাম না।'

'সেটা আপনাকে দেখে আমি বুঝেছি।' মিলি বলল, 'দেখুন, মানুষ যাই করুক, পাপ বয়ে বেড়াতে চায় না। আমার স্বামীর দ্বারা কারোর অকল্যাণ হোক, এ আমি কখনো ভাবতেই পারি না। আজ না হয় ওর অফিসের পজিশন ভালো, যাই হোক, মাইনেও খারাপ বলতে পারি না। কিন্তু আমরা তো খুব সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘর থেকেই এসেছি। আপনার ওপর আমাদের পুরো সিমপ্যাথি আছে। আপনার জন্য ওর যদি কিছু করার থাকে, ও নিশ্চয়ই করবে।'

অরূপ দু' হাত বুকের কাছে ঠেকিয়ে, মাথা নিচু করল। তারপরেই ওঠবার উদ্যোগ করে বলল, 'এবার আমি যাই। আপনাদের অনেক দেরি করিয়ে দিয়েছি।'

'এমন কিছু না।' মিলি উঠে দাঁড়াল, 'আমরা মোটামুটি তৈরিই আছি।'

এবার বেরিয়ে পড়ব। আপনি কি কলকাতায় থাকেন?'

অরূপও উঠে দাঁড়াল, বলল, 'না, প্রপার কলকাতায় নয়, কাছেই।'

'অরূপবাবু, পুলিশি তদন্তের পর, আপনাকে ব্যাঙ্ক যদি চাকরিটা দেয়, সেটাই হবে সব থেকে ভালো।'

অতনুও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চটকলের মাইনে ব্যাঙ্কের তুলনায় খুবই কম। এক লাখ টাকা সুদসুদ্ধ শোধ দেওয়া একটা বিরাট ব্যাপার। আমি আপনার জন্য চেষ্টা করব। আর যদি ব্যাঙ্ক আপনাকে নিয়ে নেয়, তা হলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন।'

অরূপ বলল, 'নিশ্চয়ই জানাব স্যার। আপনাদের এসে প্রথম জানিয়ে যাব। আমি শুনেছি, আমাদের ইউনিয়ন আমাকে ব্যাক করতে পারে। তা যদি করে তবে হয় তো চাকরিটা থেকে যেতে পারে।'

মিলি বলল, 'ভগবান করুন, তাই যেন হয়।'

অরূপ দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে মিলিকে বলল, 'আমি আজ তাহলে আসি।'

'কলকাতার পথেই তো আপনার বাড়ি পড়বে।' মিলি বলল, এবং অতনুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'অরূপবাবু তো আমাদের সঙ্গেই যেতে পারেন?'

অরূপ হাত জোড় করে, নিজেই ব্যস্ত কুণ্ঠিত হয়ে বলল, 'না না, আমার জন্য ভাববেন না। আপনারা যে সিমপ্যাথি দেখিয়েছেন, সেটাই আমার কাছে যথেষ্ট। আমি বাসে করে চলে যাব।'

অতনুও তাই চাইছিল। মিলির সরল অন্তঃকরণের কথা সে জানে। কিন্তু কাকে কখন কতোটা প্রশ্রয় দেওয়া উচিত, সেটা বিচার করে উঠতে পারে না।

অরূপ অতনুর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে, নম্র স্বরে বলল, 'যাচ্ছি স্যার।'

'হ্যাঁ আসুন।' অতনু দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল।

মিলি বলে উঠল, 'চাকরিটা হলে অবশ্যই জানাবেন। আপনি ইচ্ছে করলে এমনিতেও আমাদের এখানে আসতে পারেন, শনিবার সন্ধ্যা ছাড়া।'
অরূপের চোখ দুটো এক মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'আপনাদের আবার বিরক্ত করা হবে।'
'বিরক্ত কিসের?' মিলি বলল, 'সপ্তাহের অন্যান্য সন্ধ্যাগুলো তো আমাদের প্রায় এমনিতেই কেটে যায়। সময় পেলে আসবেন, আপনাদের বাড়ির কথা শোনা যাবে।'
অরূপ যেন কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে গেল। কোনো জবাব দিতে পারল না। কেবল কোনো রকমে ঘাড় কাত করে, আবার দুজনকে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে গেল। অতনু দরজাটা বন্ধ করে দিল। মিলি ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, 'সত্যি, বেচারির সবে কেরিয়ারের রাইজিংয়ের সময়, আর এ সময়েই এত বড় একটা দুর্ঘটনা।'
'লাক! ভাগ্য মিলি।' অতনু ঘরে যেতে যেতে বলল, 'তুমি তো বললেই, ভাগ্যের পরিহাস। ভাগ্য যে কার জন্যে কী রেখে দিয়েছে, কেউ বলতে পারে না। সেই কী যেন একটা কথা আছে, পুরুষস্য ভাগ্যং, স্ত্রিয়াশ্চ-রিত্রম্, সেই রকম আর কি। ও বিষয়ে কিছু বলা যায় না।'
মিলি ঘরে ঢুকে বলল, 'দুরবস্থায় পড়লে, এ সব দিয়ে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায় না, যাই বল। এই ছেলেটা কিসের দোহাই দিয়ে আজ ভাগ্যকে মেনে নেবে বল তো? আর ওই স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম ও সব বাজে কথা আমি মানি না। শাস্ত্র মেয়েদের সম্পর্কে সব সময়েই ও রকম উদ্ভট কথা বলেছে। সব মেয়েদের চরিত্র যদি ও রকম হতো, তা হলে পুরুষরা সংসারে টিকতে পারত না।'
অতনু হেসে বলল, 'সব মেয়ে নয়, তবে কিছু কিছু মেয়ে তো আছে। যাক সে সব কথা, মিউ কোথায়? তৈরি? চল বেরিয়ে পড়ি। এগারোটা বাজতে চলেছে।'

মিলি শোবার ঘরে চলে গেল। অতনুর চোখের সামনে ভেসে উঠল, একশো টাকার হাজারটা নোটের ঝকঝকে বাণ্ডিলটা। সাপের বাসার মতো, নিরাপদ ঠাণ্ডা জায়গায় যেন যখ দেওয়া রয়েছে। গতকালও সে একবার দেখে এসেছে, বাণ্ডিলটার গায়ে হাত বুলিয়ে এসেছে। সময় মতো সরাতে হবে। পুরুষস্য ভাগ্যং। হ্যাঁ, ঠিক কথা, পুরুষস্য ভাগ্যং। স্ত্রী চরিত্রের কথাটা সত্যি বাজে। মিলিকে নিয়ে তার কোনো দুশ্চিন্তাই নেই। অরূপ ছেলেটা এসে ভালোই হয়েছে। কথাবার্তা শুনে আরও খানিকটা আশ্বস্ত হওয়া গেল। অতনুর ওপর সন্দেহের কালো ছায়া আর কোথাও নেই। সে এখন নিশ্চিন্ত।

৬

অরূপ অতনুর কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে এলো। দেখল, সেই ড্রাইভার সামনেই গাড়ি নিয়ে বসে আছে। ও একবার ওপরের দিকে মুখ তুলে দেখল। না, অতনু মুখার্জি বা তার স্ত্রী মিলি, কেউ দেখছে না। ওর চোখে এখন গভীর চিন্তার অন্যমনস্কতা। গালে নরম দাড়ির ভাঁজে, চোয়াল শক্ত। হাতের মুঠি পাকানো।

অরূপ কোয়ার্টারের একটা ব্লক ছাড়িয়ে, বাগানের বাঁদিকে গেল। অথচ তার যাবার কথা কম্পাউণ্ডের বাইরে, গেটের দিকে। সেদিকে না গিয়ে, সে আবার একবার পিছন ফিরে, অতনুর ব্লকের তেতলার দিকে দেখে নিল। তারপরেই বাগানের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল গঙ্গার ধারের দিকে একটি একতলা, আলাদা বাগান ঘেরা বিরাট কোয়ার্টারের দিকে। এটা ম্যানেজারের কোয়ার্টার। অথবা বাংলো বলা যায়। বড় বড় থামের ফাঁকে ফাঁকে চিক ফেলা রয়েছে। গরমের সময় কাঁচের বড় বড় পাল্লা বন্ধ করা থাকে। কারণ, ম্যানেজারের বাংলো পুরোটাই এয়ার কনডিশণ্ড। সামনের বড় দরজাটা বন্ধ। দু' দিকে ঘষা কাচের দরজাটাও তাই। বাইরে কোনো দরোয়ান নেই। কলিং বেল আছে।

অরূপ কয়েক ধাপ সিঁড়ির ওপর উঠে কলিং বেল টিপল। বেল বেজে ওঠার মৃদু শব্দ কানে ভেসে আসতেই, সঙ্গে সঙ্গে অ্যালসেসিয়ান কুকুরের গম্ভীর ঘেউ ঘেউ শোনা গেল। দরজার একটা পাল্লা খুলে গেল, এক মিনিটেরও আগে। সামনে খাকি হাফ প্যান্ট আর শার্ট পরা মজবুত শরীরের এক নেপালী জোয়ান। অরূপকে দেখে, কোনো কথা না বলেই, সরে দাঁড়াল। অরূপ ভিতরে ঢুকল।

নেপালী যোয়ান দরজা বন্ধ করল। কুকুরটা তেমনি ডেকে যাচ্ছে। তাকে দেখাও যাচ্ছে, কভার্ড আউট স্পেসের শেষে শিকলে বাঁধা রয়েছে। নেপালী জোয়ান এগিয়ে গিয়ে একটা ঘরের দরজার পর্দা তুলে ধরল। অরূপ ঘরের ভিতরে ঢুকল। ঠিক বসবার ঘর বলা যায় না। অনেকটা অফিস ঘরের মতোই, তবে আসবাবপত্র সবই মূল্যবান আর ঝকঝকে। ভিতরে জোরালো আলো নেই। বাইরের আলো বিশেষ ঢোকবার অবকাশ রাখা হয় নি। কারণ কভার্ড বারান্দায় চিক ঢাকা।

ঘরের মাঝখানে বড় একটা টেবিল ঘিরে রয়েছে কয়েকটা গদী-আঁটা চেয়ার। সোফা সেটও রয়েছে। আলমারি কয়েকটা, ঠাসা বন্দী কিছু বই। টেবিলের ওপারে, বড় চেয়ারে বসে আছেন মিলের বাঙালী ম্যানেজার শ্রী জে. কে. হাজরা। কালো রঙ, লম্বা চওড়া শরীর। মাথায় অল্প কাঁচা পাকা চুল, টিয়ে পাখির মতো নাক, বড় গোঁফ দাড়িহীন মুখে গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বের ছাপ। মোটা লেন্সের আড়ালে গাঢ় দৃষ্টি, উজ্জ্বল চোখ। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। পরনে সাদা ট্রাউজারের ওপর সাদা হাফ শার্ট। একটা ফাইল দেখছিলেন। মুখ তুলে অরূপকে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে ডাকলেন, 'এসো। বসো।'

অরূপ ঢুকে এগিয়ে গিয়ে সামনের চেয়ারে বসল। বাইরে এ্যালসেসিয়ানের ডাক বন্ধ হলো। মিঃ হাজরা অরূপের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রকম বুঝলে?'

'মনে হচ্ছে ভালো।' অরূপ বলল। এখন তার মুখে হাসি। হাসিটি প্রত্যয়ের, বলল, 'মিঃ মুখার্জি কাল রাত্রের থেকে আজ অনেকটা সহজ ছিলেন। চেহারাটা একটু শুকনো দেখাচ্ছিল, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করেছেন। মনে হলো, সিমপ্যাথেটিক।'

মিঃ হাজরার ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। বললেন, 'গুড। মিসেস মুখার্জিকে কেমন বুঝলে?'

'খুব ভালো।' অরূপের চোখে ও ঠোঁটে ঝলক দেখা গেল, বলল, 'উনি অনেক বেশি সিমপ্যাথেটিক, বলতে গেলে, যা আশা করতে পারি নি, তিনি সেইরকমভাবে আমাকে নিয়েছেন। বাইরের বড় ব্যাল্‌কনিতে বসে মিঃ মুখার্জির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মিসেস মুখার্জি মনে হলো, পাশের ঘর থেকে আমাদের কথা শুনছিলেন। আমার জন্য চা আর বিস্কুট পাঠিয়ে দিলেন। তারপরে নিজেই বাইরে এসে আমার সঙ্গে কথা বললেন।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'শী ইজ এ গুড হার্টেড উয়োম্যান। কিন্তু আসল ব্যাপারে কী বুঝলে?'

'মিসেস মুখার্জি একেবারে অন্ধকারে আছেন।' অরূপ বলল, 'তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমার বিশ্বাস হয়েছে, অতনু মুখার্জি টাকার কথা তাঁর স্ত্রীকে বলেন নি। মিসেস মুখার্জির কাছে, অতনুবাবু এখনো মুখ খোলেন নি, বোধহয় আর খোলাও সম্ভব নয়।'

মিঃ হাজরার চোখে ভ্রূকুটি প্রশ্ন দেখা দিল। অরূপ সবিস্তারে মিলির কথাগুলি বলল। মিঃ হাজরা মনোযোগ দিয়ে কথাগুলি শুনলেন। তারপরে মন্তব্য করলেন, 'হুঁ, অতনু মুখার্জি এ ব্যাপারে স্ত্রীকে ভয় পায়। দুজনের চরিত্রে এখানেই তফাৎ। মিসেস মুখার্জির মধ্যে একটা বেসিকালি সততা আছে, বুদ্ধিও আছে, কিন্তু স্বামীকে এখনো অবিশ্বাস করতে পারছে না। সুযোগ কী রকম পাবে?'

'মেলামেশার সুযোগ কিছুটা পাওয়া যাবে, সেটা মিসেস মুখার্জিই এক রকম গেটপাস দিয়ে দিয়েছেন।' অরূপ বলল, অতনু মুখার্জি বাদ না সাধলেই হয়। তবে, বোধহয় বাদ সাধবেন না, কারণ তাতে মিসেস মুখার্জি অসন্তুষ্ট হতে পারেন।'

মিঃ হাজরার হাসি আর একটু বিস্তৃত হলো, বললেন, 'দেন ইউ আর লাকি। বলা যায়, মিসেস মুখার্জির মন জয় করতে পেরেছ।'

'তিনি খুবই কাইণ্ড হার্টেড।' অরূপ বলল, 'আমার জন্য খুবই উদ্বেগ

তাঁর। নিজেই বললেন, আমি যেন শনি রবি ছাড়া মাঝে মধ্যে তাঁদের ওখানে যাই। সেটা নিতান্ত ভদ্রতা করে বলেন নি, আন্তরিকতা ছিল।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'আসল ব্যাপারে কিছু হদিশ পেলে? টাকাটা কোথায় রাখতে পারে?'

'সেটা স্যার এখনো বুঝতে পারি নি।' অরূপ বলল, 'তবে কোয়ার্টারের ভেতরে রাখেন নি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মিসেস মুখার্জির চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল। কলকাতায় কোথাও রাখার অসুবিধা আছে অতনু মুখার্জির পক্ষে। কলকাতার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ভালো নয়। হয় টাকাটা এখানেই আছে, নয় তো আর একটা জায়গাতেই রাখতে পারেন। সেটা হচ্ছে কোনো চিট ফাণ্ডে। ব্যাঙ্কে রাখার সাহস হবে না। এ রকম লুকোনো টাকা একমাত্র চিট ফাণ্ডগুলোতেই রাখা যায়। কারবারও লোভের, প্রচণ্ড সুদ পেমেণ্ট করে। সেটার খোঁজ করছি, এখনো কোনো ক্লু পাই নি। তবে আমার ধারণা, টাকাটা এখনো সরাতে পারেন নি।'

'এমন অনুমান কেন করছ?'

'এই জন্য, যে ইতিমধ্যে মিঃ মুখার্জি একমাত্র ছুটির দিনেই কলকাতা গেছেন। ওয়ার্কিং ডে-তে একদিনও যান নি। কোথায় কোথায় গেছেন, আমি মোটামুটি জানি। সে-সবই হলো বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডা। সে-সব জায়গায় টাকা নিয়ে যাবেন না। এ সব লোক, কারোকে প্রাণ ধরে বিশ্বাসও করতে পারেন না। কোনো চিট ফাণ্ডে টাকা রাখতে হলে, রবিবারে তা সম্ভব নয়। মিসেস মুখার্জিকে দিয়েই একমাত্র টাকাটা সরানো সম্ভব ছিল। কিন্তু সেদিকটা বন্ধ। তার জন্যই আমার এই অনুমান।'

'বোধহয় তোমার কথাই ঠিক।' মিঃ হাজরার কপালে গাঢ় রেখা এঁকে-বেঁকে উঠল। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললেন, 'কিন্তু কোথায় টাকাটা রাখতে পারে? এটা একটা অদ্ভুত রহস্য বলে মনে হচ্ছে। কোয়ার্টারে

রাখে নি, সেটা তো প্রথম দিন তল্লাসীতেই জানা গেছে। মুখার্জির অফিসের দেরাজ থেকে, কোনো জায়গাই বাদ দেওয়া হয় নি।'

অরূপ চিন্তিত মুখে, বিষণ্ণ হেসে বলল, 'স্যার, এটা নিয়ে আমি ভাবছি। উনি কলকাতার ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে আসার পরে, সোজা অফিসে ঢোকেন নি। কোয়ার্টারেও যান নি, সেটাও জানা যাচ্ছে, কেবল ড্রাইভার আর সেনট্রির কাছ থেকে নয়, মিসেস মুখার্জির কাছ থেকেও। মিসেস মুখার্জি আমাদের সন্দেহের বাইরে। আর থাকছে ড্রাইভার আর সেনট্রি। ড্রাইভার আর সেনট্রির হাতে পাঁচ লাখ টাকার ব্যাগ তুলে দিয়ে উনি গাড়ি থেকে নেমে ক্লাবে ঢুকেছিলেন, কারণ ওঁর নেচার্স মোশান চাপতে পারছিলেন না। এত বেশি বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন, কোয়ার্টারের তেতলায় ওঠবার সময়ও পান নি। এটা যদি একটা বাহানা হয়, তবে তার একমাত্র কারণ হলো, মিসেস মুখার্জির কাছে ব্যাপারটা গোপন করা। ক্লাব বেয়ারা বলছে, সাহেব—অর্থাৎ মিঃ মুখার্জি ঝড়ের বেগে ক্লাবে ঢোকেন। ঢুকে, বার রুমের পাশে, ভুল করে মহিলাদের ড্রেসিং রুমে ঢুকে পড়েন। ভুল করে মহিলাদের ড্রেসিং রুমে ঢুকেছিলেন, কিংবা ইচ্ছা করে, সেটা ভাববার বিষয়। ড্রেসিং রুমে ঢুকেই মিঃ মুখার্জি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তার-পরে, ধরে নিতে হবে, তিনি মহিলাদের বাথরুমই ব্যবহার করেছেন। এবং প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিনিট পরে, তিনি আবার মহিলাদের ড্রেসিং রুমের দরজা খুলেই বেরিয়ে আসেন। বেয়ারা দেখেছিল, মিঃ মুখার্জির হাতে মুখে জল, রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে এলেন, আর বেয়ারাকে হেসে বললেন, আমার দিমাক খারাপ হয়ে গেছে, আমি মেমসাহেবদের গোসল-খানায় ঢুকে পড়েছিলাম। বেয়ারাও হাসতে হাসতেই এ কথা সবাইকে বলেছে।'

এ পর্যন্ত বলে অরূপ থামল। মিঃ হাজরা মনোযোগ দিয়ে অরূপের কথা শুনছিলেন। অরূপ থামতেই বললেন, 'হ্যাঁ, এ সবই জানা কথা, তবু,

তোমার মুখ থেকে শুনে, মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা যেন মোটেই স্বাভাবিক নয়, একটা মোটিভ এর মধ্যে ছিল। কিন্তু লেডিজ ড্রেসিং রুম, বাথরুম, সবই তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। কোথাও কিছুই পাওয়া যায় নি।'

'তা যায় নি।' অরূপ বলল, 'আমি স্যার সে-কথা ভাবছি না। মিঃ মুখার্জি লেডিজ ড্রেসিং রুমে ঢুকে, সেখানেই টাকাটা রাখবেন, এতটা বুদ্ধিভ্রংশ তাঁর হয় নি। এই লেডিজ ড্রেসিং রুমে ঢোকাটাই একটা রহস্যময় ব্যাপার। তার থেকেও রহস্যময় ব্যাপার, ড্রেসিং রুমের দরজা বন্ধ করলেন কেন? ভেতরে বাথরুমে সোজা ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করতে পারতেন। কে তাঁকে দেখতে যেত? কিন্তু মিঃ মুখার্জি তা করলেন না, একেবারে সেই বিরাট দুই কামরার লেডিজ ড্রেসিং রুমের প্রধান দরজাটাই বন্ধ করে দিলেন। যার মানে, ড্রেসিং রুমের ভেতরে, উনি বাথরুমে যাচ্ছেন, না আর কিছু করছেন, তা কিছুই জানা বা দেখা গেল না।'

'তাতেই বা কা এলো গেল?' মিঃ হাজরা আবার টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'লেডিজ ড্রেসিং রুমে তো কিছুই পাওয়া যায় নি।'

অরূপ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক স্যার, লেডিজ ড্রেসিং রুমের কোথাও কিছু পাওয়া যায় নি। অবশ্য কী রকম তল্লাসী হয়েছে, আমি জানি না।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'আমি জানি। এক্সটেনসিভ সার্চ হয়েছে। বলতে গেলে, সাহেবদের জমানা চলে যাবার পরে, আমাদের দিশি মেমসাহেবরা ক্লাবের লেডিজ ড্রেসিং রুম ব্যবহারই করে না। ক'জন মহিলাই বা ক্লাবে যায়। একমাত্র খৃস্টমাস ইভ্ আর নিউ ইয়ার'স ইভের দিন ক্লাবে হৈ চৈ হয়। সাবেক কালের আয়নাগুলো আছে। আর বসবার কিছু আসন। আসলে মহিলাদের বাথরুমের জন্যই ব্যবহৃত হয়। তা, গদীমোড়া বসবার আসনগুলোর গদীর ঢাকনা পর্যন্ত খুলে দেখা হয়েছে।'

অরূপ বলল, 'পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে, এত সব কাণ্ড করা মিঃ মুখার্জির পক্ষে সম্ভব ছিল না। টাকাটা ও ঘরে নেই। কিন্তু, লেডিজ ড্রেসিং

রুম থেকে, পিছনে বাইরে যাবার একটা দরজা আছে শুনেছি।'

'ইয়েস, আছে!' মিঃ হাজরার চশমার আড়ালে চোখ দুটো জ্বলজ্বল্ করে উঠল। বললেন, 'সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে কোথায় যাবে? কোয়ার্টারে?'

অরূপ হেসে বলল, 'কোয়ার্টারে তো যান নি, সে-প্রমাণ হয়ে গেছে। ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে ক্লাবের অন্য কোনো ঘরে কি যাওয়া সম্ভব নয়?'

মিঃ হাজরার কপালে রেখা গাঢ়তর হলো। ভ্রূ কুঁচকে মিনিট খানেক ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আমি অবশ্য বছরে দু-এক দিন ক্লাবে যাই। বিশেষ গানের আসর হলে। পেছন দিকে কখনো যাই নি। মনে হয়, পেছন দিকে নিশ্চয়ই অন্যান্য ঘরে যাবার দু-একটা দরজা থাকা সম্ভব। যেমন বার রুমের পেছনে, নিশ্চয়ই কোনো দরজা আছে। বিলিয়ার্ড রুমের পাশে, পুরুষদের ল্যাভেটরিরও বোধহয় পেছনে যাবার দরজা আছে। মানে—থাকতে পারে, আমি খেয়াল করি নি। বছরে দু-একবার রবীন্দ্রসঙ্গীত বা ক্লাসিক গানের আসর হয় ক্লাবের নাচঘরের হলে। সে সময়েই আমি যাই। মিলের ম্যানেজার হয়েও ক্লাব সম্পর্কে বলতে গেলে. কোনো খবরই রাখি না। আমি ঠিক ক্লাব মাইণ্ডেড লোক নই।'

অরূপ জানে, মিঃ হাজরা মদ্য পান করেন না। এমন কি ধূমপানও করেন না। বরং পান চিবোন। অথচ সবাই জানে, উনি চটকলের একজন দুঁদে ম্যানেজার। অল্প বয়সে জুট টেকনোলজির কাজ শিখতে এসে, প্রথম জীবনে ডাণ্ডি গিয়েছিলেন। তিন বছর ডাণ্ডিতে ছিলেন। ফেরার পথে গোটা ইওরোপ। ফিরে এসে ডিপার্টমেণ্টাল ওভারসিয়ার। কোম্পানি তখনো বিলিতি। যদিও দেশ স্বাধীন হয়েছিল। ওভারসিয়ার থেকে, পথ বদল করে এসেছিলেন এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে। দেখা গিয়েছিল, সেক্ষেত্রেও তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক। প্রথমে লেবার অফিসার। যা সচরাচর হয় না। লেবার অফিসার থেকে, অফিস ম্যানেজার। অফিস ম্যানেজার থেকে কলকাতার হেড অফিসে বিজনেস্ ম্যানেজার। কিন্তু কারখানার লেবার

ট্রাবল দেখা দিতেই, ওঁকে কলকাতা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় মিলে। তখন তিনি লেবার এ্যাডভাইসার। লেবার এ্যাডভাইসার থেকে ম্যানেজার। চটকলের নাড়ি নক্ষত্র, সব তাঁর নখদর্পণে। অনেক কোম্পানি থেকেই তাঁকে অনেক বেশি মাইনের অফার দেওয়া হয়েছে, যান নি। যেতেন, যদি কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি কোনো রকম অন্যায় অবিচার করত। দু-একবার সে-রকম সংকট দেখা দেয় নি, তা নয়। সে সব ব্যক্তি বিশেষের ঈর্ষা। সংকট স্থায়ী হয় নি। কোম্পানি ওঁকে ছাড়ে নি। কারণ কোম্পানির অনেক কঠিন সংকটের সময়, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধি আর বিবেচনার সঙ্গে কার্যোদ্ধার করেছেন। অথচ শ্রমিক বা কর্মীরা ওঁর বিরুদ্ধে লড়বার তেমন অবকাশ পায় নি। তাঁর ব্যক্তি চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব মোটামুটি সবাইকে খুশি রাখতে পেরেছে। সকলের কাছে তিনি সাত্ত্বিক মানুষ বলে পরিচিত।

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। সবাই জানে, প্রতি পূর্ণিমাতে তাঁর বাংলোতে সত্যনারায়ণের পূজা হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা হয়। যে-কোনো ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি থাকেন। ইউনিয়নের লিডারদের সঙ্গে অনায়াসে মিলে মিশে কথা বলেন। শহরের সামাজিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি তথাকথিত সাহেব নন। তাঁর চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তার এটাও একটা বড় প্রমাণ, অরূপ ঘোষালকে তিনি সাহায্য করছেন।

অরূপ বলল, 'ক্লাবে আমার একবার যেতে পারা দরকার। সেখানে কোথায় কী ঘর আছে, সামনে পেছনে যাবার কোথায় কী দরজা আছে, সবই একবার দেখা দরকার।'

'সেটা তোমাকে অতনু মুখার্জিকে ম্যানেজ করেই করতে হবে।' মিঃ হাজরা বললেন, 'অন্য কারোর সঙ্গে গেলে, অতনু সন্দেহের চোখে দেখবে। তোমাকে আর একটা খবরও দিয়ে দিই। তুমি বোধহয় জানো না, অতনু এখন ক্লাব কমিটির সেক্রেটারি। আমি নাম-কা-ওয়াস্তে প্রেসিডেন্ট আছি। তবে তাতে আমার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। ওখানে হিসেবের কারচুপি করা

সম্ভব নয়। আরো অনেকে আছে। তা ছাড়া, হিসেবের আছেই বা কি। মেম্বারদের চাঁদা মদের হিসাব। বিলিয়ার্ড রুমের বা তাশ খেলার জন্য কোনো আলাদা টাকা দিতে হয় না, যেমন অন্যান্য ক্লাবে দিতে হয়। একটা লাইব্রেরি আছে। পুরনো, সাহেবদের আমলের লাইব্রেরি। সব ইংরেজি বইয়ে ঠাসা, পোকায় কেটে নষ্ট করছে। বাংলা বই ওখানে নেই। তবে, খুঁজলে এখনো কিছু ভালো ইংরেজি বই পাওয়া যায়। অতনুরা সে সবের খোঁজ রাখে বলে মনে হয় না। শুনেছি, অতনুর স্ত্রী মাঝে-মধ্যে লাইব্রেরির বই ঘাঁটে। তবে, আমার মেয়েদের সঙ্গে, সেও এ শহরের দুটো লাইব্রেরির মেম্বার। মেয়েটির এখনো কিছু পড়া-শোনার ঝোঁক আছে।'

অরূপ বলল, 'মিসেস মুখার্জি যদি আমার সহায় থাকেন, তা হলে আমার অনেক সুবিধে।'

'সে তো তুমি অনেকটা এগিয়েছ।' মিঃ হাজরা বললেন, 'চেষ্টা করলে হবে। আমার মেয়েরাও বলে, শী ইজ এ গুড হার্টেড উওম্যান। মুখার্জির থেকে তার পেটে বেশি বিদ্যা আছে।'

অরূপ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করলাম স্যার। এবার আমি যাই।'

'আমার সময় নষ্ট কিছু হয় নি।' মিঃ হাজরা বললেন, 'অফিসের কাজ কিছু ছিল, সকালেই সেরে নিয়েছি। আজ আমার বড় মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে পাত্র পক্ষের লোক আসবে, তাদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা আছে। সে-সব ওবেলা। তোমার জয়েনিং ডেট কিছু ঠিক হয়েছে?'

অরূপ বলল, 'হয়েছে। সাসপেনসন তুলে নেওয়া হচ্ছে, আগামী বুধবার আমি কাজে যাব। অতনুবাবুকে সে-কথা বলি নি। বুধবার চাকরি করে, আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসব।'

'যাক, এটা একটা ভালো খবর।' মিঃ হাজরা বললেন, 'কিন্তু খুব সাবধান, আমি যে তোমাকে কোনো রকম সাহায্য করছি, কম্পাউণ্ডে ঢোকার ব্যবস্থা

করে দিয়েছি, এ সব যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে না পারে।'

অরূপ হেসে বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। অতনু মুখার্জি আমাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছেন, আমি কেমন করে কোয়ার্টার কম্পাউণ্ডে ঢুকলাম। আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি, ওঁর দূর সম্পর্কের ভাই বলে, গেটের খাতায় নাম লিখে ঢুকেছি। তার জন্য ক্ষমা চেয়েছি। বলেছি, এ ছাড়া তাঁর কাছে যাবার আমার কোনো উপায় ছিল না।'

মিঃ হাজরা হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'যাক, সবই ঠিকভাবে চলছে। জানি না, তোমার কী ধারণা। হয়তো তোমার অনুমানই ঠিক, টাকাটা এখনো এখানেই আছে। কিন্তু মানুষের চরিত্র সত্যি বিচিত্র। অবস্থা গতিকে, সে কেমন অদ্ভুত ভাবে ক্রিমিনাল হয়ে যায়। অলরাইট, উইশ ইওর অল সাকসেস্।'

অরূপ বিনীত নমস্কার জানিয়ে বাইরে চলে এলো।

অতনু এক লক্ষ টাকার বাণ্ডিল সরিয়েছে। অরূপের ভুলের সুযোগ নিয়েছে। ঘটনা জলের মতো পরিষ্কার। অতনু নিজেই মনে মনে বলছে, অত্যন্ত নিরাপদ জায়গায়, যখ দিয়ে রাখা টাকার বাণ্ডিলটি সে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু কোথায়, সেটি যেন তার নিজের অগোচরেই রেখে দিয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আশা ছাড়লেও, অরূপ আশা ছাড়ে নি। তার দৃঢ়বিশ্বাস এখনও, টাকাটা অতনু শুধু নেয় নি। এখনো মিল কোয়ার্টারের আশে-পাশেই কোথাও আছে। বুঝতে অসুবিধা নেই, নম্র বিনীত প্রার্থীর ভূমিকায় তার আবির্ভাবের কারণ, অতনুর মন জয় করে, তার সান্নিধ্য লাভ করা। এর জন্য এক মাস ধরে সে অতনু মুখার্জির দৈনন্দিন জীবনের ওপর লক্ষ্য রেখেছে। দেখেছে, গত এক মাসের মধ্যে রবিবার ছাড়া, অতনু মিল ত্যাগ করে কলকাতায় বা শহরের আশেপাশে কোথাও যায় নি। লক্ষ্য করেছে মিলির চলাফেরা আচরণ। বুঝেছে, অতনুর কৃপা আর সান্নিধ্য লাভ

করতে হলে, মিলির সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। বাইরে অতনু যতো বড় সাহেবই হোক, যতো গেরামভারি চালেই চলুক, মিলির প্রতি তার একটা ভয় ও ভীতি আছে। এই ভয় ও ভীতিটা আসলে, মিলি কেবল নির্লোভ নয়, তার নারী চরিত্রে একটা শক্ত দিক আছে সে-কারণেই।

এই কলকারখানার কুঠি সমাজে দিশি মেমসাহেবদের চরিত্রের যে দুর্বল দিকগুলো আছে, তার তা নেই। তার মেমসাহেবি সবই স্বামীর মন রক্ষার্থে। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। সে-সীমা অতিক্রম করার রুচি বা চরিত্র কোনোটাই তার নেই। অতনুর মতো পুরুষেরও সে সাহস নেই, স্ত্রীকে সীমা অতিক্রম করতে হবে। আসলে সে একদিকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, লোভী, অন্য দিকে গোঁড়া আর রক্ষণশীল। অথচ বাইরে আধুনিকতার মুখোশ আঁটা।

অরূপ মিলির মন কিছুটা পেয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। অতনু সেটাকে খারাপ ভাবে নেয় নি। সে অরূপকে করুণা দেখিয়েছে। মনেমনে টাকার কথা ভেবেছে।

অতনুকে চোর বলা যাবে কি না, এটা বিবেচ্য। কিন্তু টাকা তার কাছে আছে। অরূপ চাকরি থেকে বরখাস্ত হয় নি। লাখ টাকা সুদসুদ্ধ ফেরত দেবার শর্তে তার চাকরি। কিন্তু অতনুর হাত থেকে টাকা উদ্ধারের পথে সে নেমেছে। অতনু মনে মনে নিশ্চিন্ত। অরূপ চারদিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রেখে ধীর গতিতে এগোচ্ছে। দাবার ছক সামনে পাতা। খেলা শুরু হয়েছে। মায়াময় এ সংসারে, খেলাটা কোন্ গতিতে চলেছে, সেটাই এখন প্রত্যক্ষ করার বিষয়।

এই আসল খেলার বাইরেও জীবন আছে। সেটাও এই খেলাকে ঘিরেই, তবে সেখানে খেলাটা গৌণ। ঘটনা প্রবাহে, জীবন সেখানে আর এক রূপে দেখা দিয়েছে।

৭

অরূপ যখন কলকাতার নিকট উপকণ্ঠে, ওর নিজের এলাকায় ফিরে এলো, বেলা তখন বারোটা বাজে। রবিবার হিসাবে বেলা বারোটা এমন কিছু বেশি না। এক মাস আগেও, ছুটির দিনগুলো কোথা দিয়ে কেটে যেত, টের পাওয়া যেত না। পাড়ার ক্লাব থেকে, কলকাতার বন্ধুবান্ধবদের আড্ডা সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেলা চলে যেত। বাড়িতেও ছুটির আমেজ। আড্ডা তো একলা অরূপের না। ওর ছোট ভাইও এখন লায়েক। বোনেরাও কিছু কম যায় না। পাড়ায় আর বাড়িতে, ওদের কলেজের বন্ধুদের আড্ডা জমে। মা সবাইকে বকা ধমক করলেও, ছুটির দিনটা মা-ও উপভোগ করেন। তাঁর উপভোগ হলো, মনের মতো বাজার, আর ইচ্ছা মতো রান্না। অরূপের বাবা গত হয়েছেন কিছুকাল। কিন্তু চার ছেলে মেয়েকে নিয়ে মা তাঁর সংসারে একটি সুখী পরিবেশ গড়ে তুলেছেন।

জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসাবে, অরূপের সঙ্গে মায়ের সম্পর্কটা একটু বেশি নিবিড়। বাবার কথা যখন বিশেষ করে মনে পড়ে, তখন অরূপের কাছেই মন খুলে কথা বলেন। অরূপ জানে, মা হাসি দিয়ে সংসারটাকে ভরিয়ে রাখেন বটে, কিন্তু বাবার সঙ্গে তাঁর যেন এক মুহূর্তেরও ছাড়াছাড়ি নেই। মা সেটা কারোকে জানতে দিতে চান না। অরূপের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন না। মা যখন সামান্য রান্না ব্যঞ্জন তৃপ্ত মুখে ছেলেমেয়েদের পাতে তুলে দেন, তখন সেই তৃপ্তির সঙ্গে একটি সূক্ষ্ম স্বামী বিচ্ছেদ ব্যথাও তাঁর হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকে। কারণ, সেই সামান্য রান্না ব্যঞ্জনের মধ্যে, স্বর্গতঃ বাবার খেতে ভালোবাসার স্মৃতি মনে জাগে। সন্তানদের প্রতি তাঁর স্নেহ আরও গভীরতর হয়ে ওঠে, স্বামীর কথা মনে করেই।

স্বামী বর্তমানে, নারী জীবনের সব থেকে বড় ভূমিকা, তিনি স্ত্রী। তারপরে তিনি জননী, সেটাও স্বামীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য একটি সম্পর্কের স্বরূপ। এবং সব মিলিয়ে, তিনি স্ত্রী, জননী, গৃহকর্ত্রী। সংসারে ক্রমে তাঁর ভূমিকা-টাই হয়ে ওঠে সব থেকে ব্যাপক বিস্তৃত। যখন আর সন্তানদের সঙ্গে স্বামীকেও আলাদা করে দেখতে পারেন না।

অরূপ ছেলেবেলা থেকে, এমনি চোখেই মাকে দেখে এসেছে। বাবারও অনুচ্চারিত নির্দেশ এমনই ছিল, তিনি নিজে এবং তাঁর সন্তানরা, সংসারে একজনেরই অধীন। তিনি হলেন মা। তাঁর নিয়মই নিয়ম, তাঁর নিয়ন্ত্রণই, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ। এ রকমটা আপনি আপনি গড়ে ওঠে না। আসলে, বাবাই মাকে সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিলেন, পরিচালিত করেছিলেন। বাবার সাহচর্যেই মা তাঁর নিজস্ব স্থানটিকে যথার্থ চিনে নিতে পেরেছিলেন। অনেকটা, প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের কাছে, নিজের আত্মসমর্পণের মতো। আদর্শ সংসার বলতে কী বোঝায়, তা নিয়ে সকলে একমত হতে পারে না। অরূপের বাবা যে-সংসার গড়ে তুলেছিলেন, তার মধ্যে জটিলতা ছিল না। অবিমিশ্র সুখ বলতে সংসারে কিছু আছে কী না সন্দেহ। কিন্তু সুখ-দুঃখ মিলিয়ে, অরূপদের সংসারটি মোটামুটি গতানুগতিকতার ছকের মধ্যেও, ছিল অনায়াস আর উজ্জ্বল। পিতামহ ছিলেন ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ। গ্রাম থেকে কলকাতার নিকট উপকণ্ঠে এসে বাড়ি করেছিলেন সন্তানদের মুখ চেয়ে। গ্রামের অবস্থা খারাপ ছিল না। নিজে শিক্ষকতা করতেন স্কুলে। বাবা স্কুল শিক্ষকের ছেলে হিসাবে, বরাবর একটা আদর্শের দ্বারা চালিত হয়েছেন। বাবার অন্য দুই ভাইও। কিন্তু সময়ের সঙ্গে, সমাজ সংসারের পরিবর্তন অনিবার্য। বাবারা তিন ভাই, পরবর্তীকালে আলাদা হয়েছেন। পিতামহ নিজেই তাঁর ছেলেদের যা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। মন কষাকষি নিশ্চয়ই হয়েছিল। কিন্তু সেটা কখনো স্বার্থান্ধ গ্লানিকর কদর্য

রূপ নেয় নি। যে যাঁর নিজের সংসারের দায়িত্ব নিয়ে, আলাদা হয়েছিলেন। পিতামহ বাবাকে কলকাতার কাছে এই বাড়িটি দিয়েছিলেন। কারণ তিনি নিজে এই বাড়িতে, শেষ জীবন অতিবাহিত করেছেন। করার কারণ একটাই ছিল। শেষ জীবনটা গঙ্গার কূলে বাস। গ্রাম থেকে এখানে এসে বাড়ি করারও প্রধান কারণ ছিল এটাই।

বাবার মৃত্যু হয়েছে অকালে। ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদ থেকে রিটায়ার করেছিলেন। সাধ ছিল, অন্ততঃ এক মেয়ের বিয়ে নিশ্চয়ই দিয়ে যেতে পারবেন, যদি দুই মেয়ের সম্ভব না হয়। কিন্তু রিটায়ার করবার পরে, এক বছর কয়েক মাস বাদেই মারা যান। অরূপ আর অলোক, দুই ছেলের ওপর তিনি মেয়েদের বিয়ের কোনো দায় দায়িত্ব রেখে যান নি। লেখাপড়া শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে, মাধুরি আর শান্তার বিয়ের কথাটা বাবা মা কখনো ভোলেন নি। গোড়া থেকেই, সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে, হিন্দু মধ্যবিত্তের যা করণীয়, কন্যাদের অলঙ্কার গড়িয়ে রেখেছেন। অবশ্য ধীরে, অনেক কাল ধরে। চাকরি জীবনের শেষে, যা কিছু প্রাপ্য, সবই দুই কন্যার বিয়ের জন্য আলাদা করে জমা আছে। সারাজীবন মিতব্যয়িতাই এটা সম্ভব করেছে। অথচ অরূপরা কখনো অনুশোচনা বা দুঃখ করার মতো অভাব বোধ করে নি। অবশ্য, বাবা গ্রামের পৈতৃক অবশিষ্ট সম্পত্তির কথাও ভেবে রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন, দুর্দিনের জন্য। সারাজীবন চাকরি করেও, গ্রামের যৎসামান্য বসত বাড়ির অংশ ও জমিজমা বরাবর দেখাশোনা করেছেন। রক্ষা করে এসেছেন। শেষের দিকে দায়িত্বটা এসে পড়েছিল অরূপের ওপর। অরূপ সে-দায়িত্ব যথাযথ পালন করে চলেছে।

মধ্যবিত্ত জীবনে, বাবার জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল অনেকটা মধ্যবিত্ত। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে কোনো আলাদা ব্যবস্থায় বিশ্বাস করতেন না। সকলের সমান অধিকার শিক্ষার ক্ষেত্রে। রক্ষণশীল বলতে যা বোঝায়, তা ছিলেন না। কিন্তু মেকি আধুনিকতার ঘোরতর বিরোধী

ছিলেন। অশালীনতা বরদাস্ত করতে পারতেন না। সেটা পোশাক-আশাক আচার-আচরণ সব কিছুতেই। ছেলেমেয়েরা বাইরে বেরোবে একসঙ্গে পড়াশোনা করবে, অতএব মেলামেশাটা অনিবার্য বলে জানতেন। আর এই অনিবার্যতার ফল, প্রেমের স্থান নিতে পারে, তাও অনুমোদন করতেন। কিন্তু তা নিয়ে, নিতান্তই পরিহাসের খেলা চলবে, সেটা বরদাস্ত করতে রাজি ছিলেন না। এ সব কথা ছেলেমেয়েদের বলতেন স্পষ্ট করে। তিনি স্ত্রৈণ ছিলেন না, স্ত্রীর প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল। অতএব প্রেমের নামে তাঁর যাই হোক, ধরা ছোঁয়ার লুকোচুরি খেলাকে অন্যায় মনে করতেন। আর চাইতেন, ছেলেমেয়েরা, তেমন কিছু ঘটলে, কখনো গোপন করবে না।

অরূপের সেটা একটা দুঃখ, ওর জীবনের এই একটা বিষয় বাবাকে বলবার সুযোগ পায় নি। ও যথার্থই প্রেমে পড়েছে কী না, তা বুঝে ওঠার আগেই, বাবা মারা যান। অথচ মন্দির পাড়ার রক্ষণশীল পরিবার, ভবনাথ গাঙ্গুলীর মেয়ে দীপ্তির সঙ্গে, চার চক্ষের মিলনটা একেবারে নির্ঘাৎ দুই হৃদয়ে বিদ্ধ করেছিল, কলকাতার ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়েই। দীপ্তি তখন সপ্তদশী, সবে হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দিয়েছে। গাঙ্গুলী পরিবারের রক্ষণশীলতার জন্য, দুজনের দেখা সাক্ষাৎ স্বভাবতই আড়াল খুঁজে নিত। পরিবারের অতিরিক্ত গোঁড়ামির জন্যই কি না, কে জানে, দীপ্তি একেবারে মূর্তিমতী প্রতিবাদ। অরূপ নিজে যেখানে মেলামেশার ব্যাপারে সব সময় সজাগ দৃষ্টি সশংকিত থাকত, দীপ্তি সেখানে অকুতোভয়ে খিলখিল হেসে, চারদিক চকিত করে তুলত। সেটাও দীপ্তি চরিত্রের একটা বড় আকর্ষণ। কারণ, অরূপের সঙ্গে ওর মেলামেশায়, কোনো পাপবোধ ছিল না। বাড়ির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত ছিল সর্বদাই।

আসলে একটা রঙের পটভূমিতে আর একটা রঙের বৈপরীত্য, চিত্রের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে। অথবা রঙের ক্ষেত্রে সেটাই পূর্ণতার ছন্দ। অরূপ

মেধাবী বুদ্ধিমান ছেলে, আচরণে শালীন, কথাবার্তায় ভদ্র। চালাক চতুর বলতে যেমন বোঝায়, ইংরেজিতে যাকে বলে স্মার্ট ও ঠিক তা ছিল না কোনো কালেই। তার অর্থ এই নয়, ও কেবল ভালো মানুষ গোবেচারা, যথা সময়ে যথার্থ কথাটি মুখে আসে না। বাক্যবাগীশ কোনো কালেই ছিল না, যাকে বলে চৌকস্। ওর চেহারার মতোই, কোমলতা আর গাম্ভীর্য মিলেমিশে আছে ওর আচরণে। কথাবার্তায় ধীর স্থির, অনেকে যা নিরীহ বলে ভুল করে।

দীপ্তিকে সেদিক থেকে বলতে হয়, দীপ্তির কিরণটা ওর সব কিছুতেই কিঞ্চিৎ প্রখর। ওর ছিপছিপে ফর্সা রঙ শরীরের তারুণ্য থেকে, কালো ডাগর চোখের ঝিলিকে, নামটা ওর সার্থক। রূপের দিক থেকে যাকে বলে দীপ্তিময়ী, তা-ই টিকলো নাক, ঈষৎ স্থূল স্বাভাবিক রক্তিম ঠোঁট। মাথা ভরতি কালো চুলের গোছা, সরু ভুরু। কালো চোখের গভীরে সর্বদাই যেন বিদ্যুতের ঝিলিক লুকিয়ে আছে। রুদ্ধ হাসির উচ্ছ্বাস থম্‌কে আছে ঠোঁটের কূলে। কালো চোখের সেই দীপ্তিকে যদি বিদ্যুৎগর্ভ বলা যায়, তাহলে তরুণীর মনের অনুচ্চারিত কথা সেখানে নিঃশব্দের ব্যঞ্জনায় মুখর। কথা বেশি বলে না। কিন্তু যা বলে, তা অনায়াসে বলে। অবশ্য বয়স যাই হোক, তবু সে রমণী। যে-কথা মুখ ফুটে বলার নয়, তা চোখের তারায় অনায়াসে। তবু মানতে হবে দীপ্তির কথায় আছে খাঁটি বাঙলার বাঁধুনি। অরূপের থেকে ওর কথা বেশি, চাঞ্চল্য চপলতাও। সময় বিশেষে সলজ্জ গম্ভীর থাকার চেষ্টা করলেও, হঠাৎ কোন্ কথায় হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়বে, নিজেরও জানা নেই। কৃত্রিমতার লেশ নেই মনে, আচরণে অকুণ্ঠ। অরূপের প্রতি ওর প্রেমে খাদ নেই বলেই, সাহসটা বেশি। রক্ষণশীল পরিবার যেমন শক্তি খাটাবার চেষ্টা করে, পরিবারের সন্তান সেই শক্তি থেকেই আপন শক্তিও সঞ্চয় করে। জোর খাটাবার শক্তিটা অন্ধ আর যুক্তিহীন, সংস্কারের বিশ্বাসটাই সেখানে বড়। সময় মন সত্যা-সত্য, কোনো কিছুরই সে মূল্য দিতে চায় না।

কিন্তু কালের একটা নিয়ম আছে, দাবীও আছে। এবং তার সঙ্গে আছে মানুষের মন, আত্মবিকাশের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এটা প্রকৃতিগতও। সে সকল বাধা ঠেলে, নিজের পথ বেছে নেবেই। বিশেষ করে তা যদি হয় প্রেমঘটিত। প্রেমও একটা শক্তি, এবং এই আত্মবিশ্বাস যদি থাকে, অন্যায় সে করে নি, তবে সে শক্তি দুর্বার হয়ে ওঠে। দীপ্তিরও উঠেছিল। তার অর্থ এই নয়, ও বাবা মাকে অশ্রদ্ধা করেছে, পরিবারকে অসম্মান করেছে। কিন্তু বাবা মা'র জিজ্ঞাসার সামনে, অনায়াসে স্বীকার করেছে। এটাও দুঃসাহসের কাজ। ভবনাথ গাঙ্গুলীর কাছে এটা বেয়াদপি ছাড়া কিছু নয়। অতএব, শাসন কষণ বাধা হয়ে উঠেছিল অনিবার্য। দীপ্তি সেই অনিবার্য-তাকে না মেনে, অরূপের সঙ্গে নিয়মিত মেলামেশা করেছে।

এ সব হচ্ছে অতীত ঘটনা। অরূপ মাকে সব বলেছিল। দীপ্তিকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল। মা দীপ্তিকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে দীপ্তি সমাজ বিজ্ঞানে এম. এ. পাশ করেছিল। অরূপের চাকরি হয়েছিল। অরূপ দীপ্তির অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। স্বয়ং ভবনাথ গাঙ্গুলীও তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছিলেন। তবু বাইরে একটা কঠিন খোলস এঁটে ছিলেন। সেই খোলস-টায় চিড় ধরিয়েছিলেন দীপ্তির মা। মেয়েকে চিনতে তাঁর দেরি হয় নি, এবং অরূপকেও। দীপ্তিকে তিনিই অনুমতি দিয়েছিলেন, অরূপকে মন্দিরপাড়ার গাঙ্গুলী বাড়িতে নিয়ে আসতে। আশঙ্কা ছিল, একটা সংঘর্ষ লাগবে, অরূপকে অসম্মানের মুখোমুখি হতে হবে। হয় নি। ভবনাথ গাঙ্গুলী হৃদয়ঙ্গম করে-ছিলেন, তাঁর আদ্যিকালের সংস্কারের থেকেও, অরূপের মতো ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হওয়াটা, বাস্তব জীবনে বড় ব্যাপার।

এই যখন অবস্থা, তখনই অরূপের হাত ফস্‌কে লাখ টাকা উধাও। ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ওপর নেমে এলো রাহুর গ্রাস। আর রাতারাতি অরূপের চারপাশের জগৎ সংসারের চেহারাটাও বদলে গেল। মা ভাই বোনদের পাংশু মুখে প্রথম উদ্বেগ দেখা দিল। তারপরে নেমে এলো একটা বিরূপতা

অথচ অরূপ প্রত্যাশা করেছিল নামবে না। মা কেঁদে বললেন, 'তো: ভবিষ্যৎ নষ্ট হলো, আমাদের কপাল পুড়ল।'
দীপ্তির মুখে নেমে এলো গভীর হতাশা। ভবনাথ গাঙ্গুলী খবরের কাগজে: হেডিংটা জোরে জোরে পড়ে শোনালেন বাড়ির সবাইকে লক্ষ্য করে 'ব্যাঙ্কের ক্যাশ থেকে লক্ষ টাকা উধাও। ক্যাশ ক্লার্ক সাস্‌পেণ্ড।' এই পথে শোনানোর মধ্যে একটা কুৎসিত ইঙ্গিত ছিল। যে-দীপ্তি অরূপের সঙ্গে প্রেমে কখনো মাথা নত করে নি, সে বাবার ইঙ্গিতের কোনো প্রতিবাদ করে নি। খবরের কাগজে, চটকলের অফিসারের কোয়ার্টারে ব্যর্থ তল্লাসী: কথাও ছাপা হয়েছিল। সংবাদ পরিবেশনে এমন একটা কাঁটা বিঁধে রইল অরূপ ঘোষাল সন্দেহমুক্ত নয়। চেনা মহলে ফিসফাস গুঞ্জন শুরু হয়ে ছিল।
অরূপের মনটা অপমানে আর কষ্টে বিমূঢ় অবশ হয়ে গিয়েছিল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে ও সকলের দিকে তাকিয়ে দেখল, ওর আসল মূর্তিটা সকলের চোখে ভেঙে খান খান। বাড়ির লোকেরা ওকে চোর ভাবে নি, জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল, এই শোকে মুহ্যমান। অরূপ যখন দীপ্তিকে তার কথা বুঝিয়ে বলতে গেল, জবাব পেল, 'আমি তোমাকে অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু এটা একটা ঘটনা। সেটাকে অস্বীকার করব কেমন করে? যদি ধরেই নিই, চটকলের সেই অফিসারই টাকাটা পেয়ে, সরিয়ে ফেলেছে, সেটা তো প্রমাণ করা যাবে না। তোমাকে সারা জীবন ভুলের মাশুল দিয়ে যেতে হবে।'
অরূপ বলেছিল, 'তা হয় তো হবে। কিন্তু দীপ্তি, আমি সৎ।'
দীপ্তি বলেছিল, 'হ্যাঁ, তুমি সৎ, কিন্তু অভিশপ্ত।'
কথাটা বলতে গিয়ে দীপ্তি কেঁদে ফেলেছিল। সে-কান্নার কারণটাও অরূপ বুঝতে পেরেছিল। অভিশপ্তের সঙ্গে সততার দোহাই দিয়ে, সারাজীবন দীপ্তিকেও অভিশাপের বোঝা বহন করতে হবে। দীপ্তির কান্নার অনুচ্চারিত কথা অরূপ শুনতে পেয়েছিল।

কিন্তু অপমান, গ্লানি, কষ্ট, কোনো কিছুতেই অরূপ হতাশ হয় নি। সংসারের চেহারাটা দেখে, অবাক দুঃখে ওর বুক বিদীর্ণ হয়েছিল। তবু, ও মনে মনে প্রস্তুত হয়েছিল। কারণ, পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা ভেবে, ও নিশ্চিন্ত হয়েছিল, টাকা অতনু মুখার্জির হাতে গিয়েছে। হাজারটি একশো টাকার নোটের নাম্বার ওর কাছে ছিল। অফিসের কর্তৃপক্ষ, সহকর্মী আর ইউনিয়নের বিশ্বাস আর সমবেদনা ছিল ওর ওপর। পুলিশ ওর সঙ্গে কথা বলে, অমনোযোগ ছাড়া, আর কোনো দোষ খুঁজে পায় নি। ও অতনু মুখার্জির প্রতি অতন্দ্র প্রহরীর মতো নজর রেখেছিল। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে বলে, মিলের ম্যানেজার মিঃ হাজরাকে ওর মনোগত বিষয়টি জানিয়েছিল। ওঁরা অনুমোদন করেছেন, সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

অরূপ এ সব কথা একমাত্র দীপ্তিকেই বলেছে। দীপ্তি শুনেছে, কিন্তু কোনো আশার আলো ওর চোখে ফোটে নি। ভ্রূকুটি চোখে কৌতূহলের ঝিলিক ফুটেছে। এবং কিছুটা উদ্বেগের সঙ্গে বলেছে, 'এ সব করতে গিয়ে আবার নতুন কোনো বিপদে পড়বে না তো?'

'যদি আবার অসাবধান হয়ে ভুল করি, তবে আসল কাজটা ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বিপদে পড়ব না।' অরূপ বলেছে।

৮

অরূপ পাড়ার ভিতরে ঢুকে, বাড়ি যাবার পথে, ক্লাবের সামনে একবার দাঁড়াল। রবিবারের বেলা বারোটায়, ক্লাব এখনো জমজমাট। কয়েকজন বসে ছিল ক্লাবের বাইরে বেঞ্চির ওপর। ওরা নিজেদের মধ্যে কিছু একটা নিয়ে তর্কবিতর্ক করছিল। এ সব তর্কবিতর্ক ইন্দিরা গান্ধী জ্যোতি বসু থেকে উত্তমকুমার অমিতাভ বচ্চন রেখা রাখী সবই হতে পারে। অনেকটা জায়গা নিয়ে ক্লাব ঘর। আসলে আদ্যিকালের এক ধনীর গৃহের ঠাকুর-দালান আর উঠোন নিয়ে ক্লাব। মূল প্রাসাদ ভেঙে, ছোট ছোট প্লটে বিক্রি করেছে অধস্তন বংশধরেরা। সেখানে বেশ কিছু নতুন বাড়ি উঠেছে। এক তলা থেকে চার তলা। বিক্রি করতে পারে নি এই ঠাকুরদালান আর উঠোন। পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই স্থানীয় একদল ঠাকুরদালানটিকে তাদের বারো-ইয়ারি ক্লাব ঘর করে নিয়েছিল। বারোয়ারি পূজা থেকে, স্বদেশী আন্দোলন, সব কিছুই এই ঠাকুরদালান ঘিরে গড়ে উঠেছিল। সেই থেকেই ঠাকুর-দালান আর উঠোন বারোয়ারি সম্পত্তি। একটা লাইব্রেরিও আছে ভিতরে। দেওয়াল তুলে ঘর করা হয়েছে। রিডিং রুম নেই। তার বদলে ক্যারাম, তাশ, দাবা খেলার আলাদা ঘর।

অরূপ এই ক্লাবের মেম্বার। ও জানে ভিতরে এখন ক্যারাম তাশ দাবা চলছে। যারা বাইরে বসে আড্ডা দিচ্ছিল, তারা অরূপের দিকে তাকাল। চোখে ওদের সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা, ঠোঁটের কোণে হাসি। গত এক মাসের মধ্যে ক্লাবের বন্ধুদের কাছেও ও বিতর্কিত চরিত্র হয়ে উঠেছে। ক্লাব নিয়ে মাতা-মাতি বলতে যা বোঝায়, ও কোনো দিনই তা করে নি। অর্থাৎ, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারী হবার কোনো ইচ্ছা ছিল না। কমিটি মেম্বারও

না। কিন্তু, কমিটিতে ওকে থাকতেই হয়েছে, বন্ধুদের ইচ্ছায়। সকলের চোখে, অরূপ হলো অমায়িক, গম্ভীর আর সৎ ছেলে। ছোট বড়, সকলের সঙ্গেই ওর সম্পর্ক ভালো। গত এক মাসের মধ্যে সব কিছুই বদলে গিয়েছে।

অরূপ জানে, ব্যাঙ্কের টাকা খোয়া যাবার ঘটনা নিয়ে, ক্লাবে ওর সম্পর্কে দুটো ধারণা হয়েছে। একদল মনে করে, টাকাটা অরূপ সরিয়েছে। আর একদল এ ধারণার ঘোরতর বিরোধী। অরূপের আড়ালে, এ নিয়ে দুই দলে প্রায়ই তর্কবিতর্ক হয়। সেই তর্কবিতর্ক মাঝে মাঝে ঝগড়ায় রূপান্তরিত হয়। অরূপ জানে, অন্যদের কাছে খবর শোনে, আর অস্বস্তি বোধ করে। অস্বস্তি থেকেই, ইদানিং ক্লাবে যেতেও ভালো লাগে না।

যারা বাইরে বসে ছিল, তাদের মধ্যে একদল গলা তুলে জিজ্ঞেস করল, 'রোববারে এত বেলায় কোথা থেকে ফিরলি ?'

অরূপ অপ্রস্তুত হেসে বলল, 'একটু কলকাতায় গেছলাম। চলি।'

'আরে শোন্ শোন্।' আর একজন বলল, 'কলকাতায় কোথায় গেছিলি ? লালবাজারে ?'

অরূপ অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'লালবাজারে যাব কেন ?'

'সে তো তুই ভালো জানিস।' একজন বলল, 'কী সব পুলিশি তদন্ত-টদন্ত চলছিল না ?'

অরূপ জানে, এ কথা বলার উদ্দেশ্য, ওর বর্তমান অবস্থা জানতে চাওয়া। কেউ কেউ এক রকম ধরেই নিয়েছে, ওর জেল হয়ে যাবে। ওদের দোষ দেওয়া যায় না। এ সব ব্যাপারে সকলের সম্যক কোনো ধারণা নেই। বাইরের মানুষের পক্ষে সব কিছু জানা বা বোঝা সম্ভবও নয়। লোক-চরিত্রের এটা একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য, অবাক হবার মতো কোনো ঘটনা ঘটলে, তা নিয়ে নানা রকম গুজব তৈরি করা, আর গুজব ছড়ানো। ঘটনার সঙ্গে অপরাধের গন্ধ থাকলে, কেচ্ছা কাহিনী তৈরি করতেও সময়

লাগে না। গল্প লেখক আর সাংবাদিকদের থেকে, সাধারণ মানুষ অনেক বেশি নিপুণ গল্পের স্রষ্টা। অনেক বেশি তুখোড় গল্প বলিয়ে।

অরূপ বলল, 'পুলিশি তদন্ত যা হবার হয়ে গেছে। আগামী বুধবার থেকে চাকরিতে জয়েন করছি।'

কথাটা শুনে, এক মুহূর্ত কারোর মুখ থেকেই একটা কথাও বেরোল না। হতবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। অরূপ মিথ্যা কথা বলে নি, তবে কথাটা এখানে বলার প্রয়োজন ছিল না। ও ইচ্ছা করেই বলল। কথাটা বলে, ও হাত তুলে, বিদায় নিয়ে পা বাড়াল। একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, চিৎকার করে বলল, 'আরে শোন্, শোন্ অরূপ। সেই লাখ টাকা তা হলে হজম হয়ে গেল?'

'হজম?' অরূপ ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'হজম মানে কী?'

বন্ধুটি চোখ কুঁচকে, ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বলল, 'হজম মানে জানিস না?'

অরূপ জবাব দেবার আগেই, আর এক বন্ধু, রুখে উঠে, অন্য বন্ধুটিকে বলল, 'তুই-ই বল্ না, হজম বলতে কী বলতে চাইছিস? আর অরূপকে তোর ও রকম করে বলবার মানেই বা কী?'

অরূপকে যে সন্দেহ করে, অপমান করার জন্যই হজমের কথাটা বলেছিল, সে এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। সে এ রকম পালটা আক্রমণ আশা করে নি। কিন্তু পরমুহূর্তেই সেও রুখে উঠে বলল, 'কী বলতে চাইছি, আর কী রকম ভাবে বলছি, সে অরূপই ভালো জানে।'

'না, নরেন, আমি ভালো জানি না।' অরূপ হেসে শান্ত ভাবে বলল, 'তুই হজম বলতে কী বোঝাতে চাইছিস, আমি বুঝতে পারছি না।'

নরেন আবার একটু ঠেক খেয়ে গেল। অন্যান্যদের দিকে তাকিয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বলল, 'তা বুঝতে যখন পারছিস না, আমার আর কিছু বলার নেই।'

এবার অন্য বন্ধুটি বলল, 'বলার যখন কিছু নেই, তখন আজেবাজে কথা বলিস

না।'

নরেন রেগে গেল, মুখ শক্ত করে ঝেঁজে বলল, 'কেন ? তোর কথায় আমাকে চুপ করে থাকতে হবে নাকি ? যা বলেছি, ঠিক বলেছি। লাখ টাকাটা কেমন করে হজম হয়ে গেল, তা জানতে চাওয়ায় দোষটা কী ?'

'দোষ হলো, তুই অরূপকে ইনসাল্ট করতে চাইছিস।' অন্য বন্ধুটি ঝেঁজে উঠে বলল, 'নিজেকে বেশি চালাক ভাবিস না নরেন। তোর মনের কথা ভালোই জানি। তুই বলতে চাস, অরূপ লাখ টাকা হজম করে দিয়েছে ?'

নরেন খাঁটি খোঁচাটা খেয়ে, আরও বেশি তেতে উঠল। বলল, 'সেটা আমাকে না জিজ্ঞেস করে, লোককে গিয়ে জিজ্ঞেস কর না ? তারা কি বলে, শুনে নিস।'

পরিণামে, উত্তেজিত কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। অরূপ অস্বস্তি বোধ করল। ভাবল চলেই যাবে। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। ও এগিয়ে গিয়ে বলল, 'তোরা চুপ কর ভাই, আমার কথা একটু শোন।'

তথাপি তর্ক আর ঝগড়া থামতে চায় না। অরূপ দু' দলকে শান্ত করে, নরেনের উদ্দেশ্যে বলল, 'শোন নরেন, ব্যাঙ্কের টাকা যে অনেকে হজম করছে না, তা নয়। খবরের কাগজ পড়লেই দেখতে পাবি, কতো লোকে কতো রকমে লোন নিয়েছে। গভর্ণমেণ্ট অনেকের হদিস করতে পারে নি। যাদের হদিস করতেও পেরেছে, তারাও অনেকে রেহাই পেয়ে গেছে, গভর্ণ-মেণ্টের নিজেদের দলের লোক বলে। লাখ লাখ টাকা নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শহরের অনেকে ছিনিমিনি খেলছে। কিন্তু আমি আফটার অল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ী। আমার রেহাই নেই। চাকরিটা পাচ্ছি এই শর্তে, আমার মাইনে থেকে লাখ টাকা সুদসুদ্ধ আদায় করবে। এখানে হজম করার কোনো প্রশ্ন নেই। যদি আমি টাকাটা সরাতামই, তা হলে সুদসুদ্ধ টাকা শোধের শর্তে চাকরি নেব কেন ? আর বোকার মতো এ রকম চুরি কেনই বা করতে যাব বল ? কেউ কি তা করে ?'

নরেন আর তার সমর্থকরা সকলেই চুপ করে রইল। নরেনের বিরোধী হারু আবার রুখে কিছু বলতে যাচ্ছিল। অরূপ তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'এই হারু, নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে ঝগড়া করার কোনো মানে হয় না। ভুল তো নরেন একলা বোঝে নি, অনেকেই আমাকে ভুল বুঝেছে। তা কী করা যাবে। হয় তো এমন দিন আসতে পারে, যেদিন আসল সত্য প্রকাশ হবে। না হলে, আমার কপালে যা আছে, তাই হবে। বলতে গেলে, আমার জীবনটা তো নষ্টই হয়ে গেল। সারা জীবন ধরে লাখ টাকা শোধ করা…।' অরূপ এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর হেসে বলল, 'চলি। তোরা এ নিয়ে আর বাগবিতণ্ডা করিস না।' অরূপ দ্রুত বাড়ির দিকে চলল। ও ভাবছে দীপ্তির কথা। দীপ্তি জানে, ও কোথায় গিয়েছিল। ফলাফল শোনার জন্য হয়তো দীপ্তি অরূপদের বাড়ি বসে আছে। কিন্তু বাড়িতে ঢুকে দেখল, বাইরের ঘরে মাধুরি আর শান্তা ওদের আরও দুই মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে। ওকে দেখে সবাই চুপ করে গেল। মাধুরি আর শান্তা, এক মাস আগে হলে, অরূপকে দেখে, উচ্ছ্বসিত হয়ে নিজেদের কাছে ডেকে বসাত, আড্ডা দিত। ইদানিং ওরা অরূপের সম্পর্কে কেমন উদাসীন হয়ে গিয়েছে। অরূপের বুকের মধ্যে একটা অসহায় কষ্ট টনটন করে ওঠে। এটাই বোধহয় সংসারের আসল চেহারা। সংসারের যে আশা আকাঙ্ক্ষা ওকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল, ওর যে একটা ভাবমূর্তি ছিল, একটি ঘটনার আঘাতে সবই ভেঙে গিয়েছে। অরূপ যেন এখন অনেকটা খরচের খাতায়। একদিক থেকে ভাবতে গেলে, ব্যাপারটা তা-ই। মাস মাইনের অনেকটাই কমে যাবে। ও সংসারের বোঝা হয়ে উঠবে না নিশ্চয়ই, কিন্তু সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যে ভাটা তো পড়বেই। সেটাই ওর অপরাধ। মা যদি ওর সম্পর্কে উদাসীন হয়ে উঠতে পারেন, মাধুরি আর শান্তার দোষ কি। এমন কি অলকও মোটেই খুশি নয়।

আশা ভঙ্গ তো অনেক দিক থেকেই হয়েছে। মাধুরির বিয়ে স্থির হয়ে

গিয়েছে। মাধুরির বিয়ের পরেই, অরূপের বিয়ে হবে, সেটাও এক রকম স্থির ছিল। তার মধ্যে অরূপের একটা প্রমোশন হবার কথা। তার পরেই কয়েক মাসের জন্য একটা বিশেষ ট্রেনিংয়ের প্রয়োজনে ওর বম্বে চলে যাবার কথা ছিল। সেই ট্রেনিং এবং পরীক্ষার পরে ওর অফিসার র‍্যাংকে ওঠবার কথা। সে সবই এখন ধামা চাপা পড়েছে।

অরূপ মাধুরি আর শান্তার বন্ধুদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে, ওদের মধ্যে নানা সংশয় আর জিজ্ঞাসা। ক্লাবের বন্ধুদের মতোই। তবু অরূপ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে জিজ্ঞেস করল, 'দীপ্তি এসেছিল নাকি?'

'না।' মাধুরি বলল।

অরূপ নিজের ঘরে চলে গেল। মনটা দমে গেল। ভেবেছিল, দীপ্তি নিশ্চয়ই আসবে। হয়তো ওর দেরি দেখে চলে যাবে। কিন্তু দীপ্তি আদৌ আসেই নি। গত এক মাস ধরে, দীপ্তির আসা যাওয়া অনেক কমে গিয়েছে। অথচ প্রতি রবিবারে দীপ্তি সকালে একবার আসতই। অন্যান্য দিনও মাঝে মধ্যেই সন্ধ্যের দিকে একবার ঘুরে যেত। গত চারটি রবিবারের একটা রবিবারেও সে আসে নি। সন্ধ্যের দিকে কয়েক দিন এসেছে। অরূপও ওদের বাড়ি গিয়েছে। দীপ্তির বাবা বিশেষ কথাবার্তা বলেন না। লক্ষণীয়, দীপ্তির মায়েরই কোনো পরিবর্তন হয় নি। দীপ্তির পরিবর্তনও যেখানে চোখে পড়বার মতো, সেখানে ওর মায়ের এই অপরিবর্তনীয় চেহারা ও আচরণ অবাক করার মতো। সংসার এখানেও এক বিচিত্র রূপে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের থেকে বিচিত্রতর বোধহয় কিছু নেই। দীপ্তির মা অকুণ্ঠ বিশ্বাসে, প্রথম থেকেই বলে আসছেন, 'একে বলে গ্রহের ফের। গ্রহ কাটলে দেখা যাবে সব অন্য রকম। তবে আমি বলে রাখছি, ভগবান এর একটা হেস্তনেস্ত করবেনই। একটা নির্দোষ ছেলেকে এ রকম কলঙ্ক দিয়ে, চোরেরা রেহাই পাবে না।'

দীপ্তি ওর মায়ের কথা শুনে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসে। বলে, 'মা, তোমার

ভগবানের যখন এতই দয়া, তিনি মিছিমিছি কলঙ্কটা চাপাতে গেলেন কেন ?'

দীপ্তির মা বলেন, 'এ সব না ঘটলে সংসারের আসল চেহারাটা লোকে দেখতে পায় না। জানবি, ওটাও ভগবানের একটা খেলা। বইয়ে পড়িস নি, কত সৎচরিত্র ভালো মানুষকেও মিছিমিছি কলঙ্কের ভাগী হতে হয়েছে ?'

দীপ্তি হেসে বলে, 'ও সব পুরাণে আর রূপকথায় হয়। আজকাল ভালো মানুষের সেই জগৎ নেই মা। দিনকাল বদলে গেছে। তুমি যাদের কথা বলছ, আগে তাদের ভুলের জন্য অভিশাপ লাগত, আবার শাপমোচন হতো। এখন ও সব আর হয় না।'

দীপ্তির মা দৃঢ় বিশ্বাসে বলেন, "আমি তোদের মতো ভাবি না। ভালো মানুষের জগৎ নেই, সবাই খারাপ হয়ে গেছে, আর খারাপ লোকেরা মেরে ঘুরে বেড়াবে, এ হয় না।'

এ সব তর্কের শেষ নেই। কিন্তু অরূপ দীপ্তির মায়ের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করে। ওর নিজের মায়ের সঙ্গে তুলনাটা স্বভাবতই মনে আসে। সংসারটা কি আশ্চর্য বৈপরীত্যে ভরা। যে মায়ের সঙ্গে অরূপের সব থেকে বেশি মন জানাজানি ছিল, সেই মা কেমন আড়ষ্ট আর বিরূপ হয়ে উঠেছেন। অথচ দীপ্তির মা, যাকে ও মাসীমা বলে ডাকে, তিনি কত অনায়াসে ওর সম্পর্কে অন্য এক বিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে আছেন। তার ফলে আর কিছু না হোক, মনে অনেক শক্তি পাওয়া যায়।

৯

বিকালে অরূপ গেল মন্দিরপাড়ায় দীপ্তিদের বাড়িতে। মন্দিরপাড়া নামের একটাই কারণ। পাড়াটা গঙ্গার ধারে, এবং একটি প্রাচীন কালী মন্দিরকে ঘিরে দ্বাদশ শিবের মন্দির আছে। তা ছাড়াও আছে প্রাচীন একটি টেরা-কোটার কাজ করা রাধাকৃষ্ণের মন্দির। দুই মন্দিরেই এখনও নিত্যপূজা হয়। কালী মন্দিরে বিশেষ করে, প্রতি মঙ্গলবার ঘটা করে পূজা হয়। প্রতি সপ্তাহেই কিছু মানসিক বলি লেগেই থাকে। কালী পূজার রাত্রে বিশেষ ধূমধাম হয়। আর চৈত্র মাসে অনেক কাল ধরেই একটি মেলা বসে।

অরূপ গত এক মাসে, দীপ্তিদের বাড়ি খুব কমই এসেছে। অথচ আসবার জন্য মনে মনে ব্যাকুলতা বোধ করে। দীপ্তির বিরাগ, আর ওর বাবার বিরূপতা ওকে আড়ষ্ট করে তোলে। দীপ্তিকে ও বুঝতে পারে। দীপ্তির রাগ বিরাগ সবটাই হতাশাজনিত। যে-ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও দেখত, সে স্বপ্নটা হঠাৎ ভেঙে গিয়েছে। এ রকম ক্ষেত্রে, সচরাচর বুদ্ধি বিবেচনা তেমন কাজ করে না। স্বপ্ন ভঙ্গের হতাশাটাই বড় হয়ে ওঠে। দীপ্তি সেই স্বপ্নভঙ্গের মধ্য দিয়েও, অরূপের সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনে মানিয়ে চলার মনোবল সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছে। অরূপ সেটা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে, একজনের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার যে অগভীর মানসিকতা থাকে, দীপ্তি ঠিক সেই জাতের মেয়ে নয়। ভিতর থেকে অরূপকে অস্বীকার করতে পারছে না। অথচ মনটা অনেকখানি হতাশায় ভেঙে পড়েছে। ওর বাবা, সেই হতাশায় ইন্ধন যোগাচ্ছেন। কিন্তু ওর মা অন্য দিকটাকেই তুলে ধরেন।

অরূপ প্রথম দিকে, দীপ্তির বিরূপতায় নিজেই সরে যাবে ভেবেছিল।

ওর নিজের সম্পর্কে চিন্তায় কোনো দুর্বলতা নেই। আত্মসম্মান বোধও ওর তীব্র। কিন্তু ভালোবাসা মানুষকে বিভ্রান্ত করে না। ও দীপ্তিকে ভালোবাসে। দীপ্তির হঠাৎ আঘাতে, ভুল বোঝার কারণে, ও যদি সরে যায়, সেটাই হবে কাপুরুষোচিত ব্যাপার। দীপ্তির ভুল ধারণাকে সংশোধন করাটাও ওরই কর্তব্য। অন্তত দীপ্তি ত্যাগ না করা পর্যন্ত, অরূপ ওকে ত্যাগ করতে পারে না।

ভবনাথ বাড়িতে ছিলেন না। মা জানালেন দীপ্তি ছাদে আছে। অরূপ ছাদে গিয়ে দেখল, দীপ্তি গঙ্গার দিকে মুখ করে আল্‌সের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। অরূপ কাছে যেতেই, দীপ্তি ফিরে তাকাল। দেখল একবার অরূপের আপাদমস্তক। এখনও ওকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। কিছু ভাবছিল। ওর সেই হাসি উচ্ছলতা নেই। মাস খানেকের মধ্যে চেহারাটাও খারাপ হয়েছে। দীপ্তির এই চেহারা দেখলে অরূপের মনটা আরও বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। দীপ্তির সেই উচ্ছ্বাস নেই, হাসি নেই, চোখে ঠোঁটে হাসির ঝিলিক নেই। অরূপকে দেখলেই, ওর মধ্যে যে একটা সোহাগের আবেগ ফুটে ওঠে, তা যেন কোথায় থম্‌কে রয়েছে।

অরূপ বলল, 'ও বেলা তোমাকে আমাদের বাড়িতেই পাব ভেবেছিলাম।'

'যাব ভেবেছিলাম।' দীপ্তি বলল, 'শেষ পর্যন্ত আর বেরোতে ইচ্ছে করল না। কখন ফিরেছ ?'

অরূপ বলল, 'তা প্রায় সাড়ে বারোটা হবে।'

'কী হলো ? কিছু কাজ হলো ?' দীপ্তির জিজ্ঞাসার মধ্যে ঔৎসুক্য স্পষ্ট।

অরূপ সমস্ত ঘটনা ওকে বলল। শুনতে শুনতে, দীপ্তির ভুরু কুঁচকে উঠল। বেশ বিরূপ আর সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তা অতনু মুখার্জির স্ত্রীকে তোমার হঠাৎ এত বিশ্বাস করার কী কারণ ঘটল ?'

'কেন, সব কথা শুনে তোমার মনে হয় না কি, মিসেস মুখার্জি টাকাটার কথা কিছুই জানেন না ?' অরূপ জিজ্ঞেস করল।

দীপ্তি মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমার বিশ্বাস হয় না। অতনু মুখার্জি যদি টাকাটা সরিয়ে থাকে, তা হলে তার স্ত্রী নিশ্চয়ই তা জানে। তুমি বোধ হয় তার সুন্দর মুখ দেখে, আর মিষ্টি কথায় ভুলেছ।'

অরূপ মনে মনে হাসল, কিন্তু গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি ভুল বুঝতে পারি, কিন্তু মিঃ হাজরাও কি ভুল বুঝেছেন বলতে চাও?'

'ভুল বোঝাবুঝির কথা হচ্ছে না।' দীপ্তি রুষ্ট স্বরে বলল, 'মিঃ হাজরাও সুন্দর মুখ দেখে ভুলেছেন। মেয়েদের ছল ছাতুরি বোঝা এত সহজ নয়।'

অরূপ বলল, 'মেয়েদের ছল ছাতুরি কেমন, জানি নে। তবে আমার কিন্তু ধারণা, মিসেস মুখার্জি টাকাটার কথা জানেন না। ভদ্রমহিলার চরিত্র একটু অন্য রকম। উনি যদি জানতেন, তাহলে আমাকে প্রথমেই আপদের মতো বিদায় করে দিতেন। ফিরে আবার যেতে বলতেন না।'

'আর তাতেই তুমি ভুলে গেলে!' দীপ্তির ঠোঁট বেঁকে উঠল, বিদ্রূপের স্বরে বলল, 'সে তো তোমাকে আবার যেতে বলবেই। যাতে তোমার মন গলে যায়, কোনো সন্দেহ না করতে পারো। তার মানে, অতনু মুখার্জির তবু তোমাকে নিয়ে খানিকটা ভয় আর অস্বস্তি আছে। তার স্ত্রী আরো ঘুঘু। তোমাকে দেখেই বুঝে নিয়েছে, এ নেহাত চাকরির জন্য আসে নি, নিশ্চয়ই কোনো মতলবে এসেছে। আর তোমার মতলব তো একটাই, তাই প্রথম থেকেই, তোমার ওপরে সে টেক্কা মেরেছে।'

অরূপ একটু বিভ্রান্ত বোধ করল। দীপ্তি এতটা জোর দিয়ে বলছে কেমন করে? সত্যি কি তাই? ওর চোখের সামনে মিলির মুখটা ভেসে উঠল। সেই সঙ্গে অতনুর চোখ মুখের ভঙ্গি, কথাবার্তা আচরণও। অতনুর কথাবার্তা আচরণ পরিষ্কার, সহজেই ধরা যায়। বিশেষ করে গতকাল রাত্রে অরূপকে দেখার পরে, এক রাত্রেই তার চেহারার পরিবর্তন লক্ষণীয় ছিল। তার স্ত্রী বুদ্ধিমতী নিঃসন্দেহে। কিন্তু তার চোখে মুখে ছলনা ছিল না বলেই অরূপের বিশ্বাস। লোকচরিত্র কি সে একটুও বুঝতে পারে না?

নিজের মনের মধ্যে ডুব দিয়ে, মিলির মুখটা সে গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করল। মেয়েদের ছলচাতুরি? মিলির মুখে কি সেই অভিব্যক্তির ছায়াও ছিল? একেবারেই মনে হয় না। তবু সে কথা দীপ্তির সামনে বলল না। কেবল চিন্তিত ভাবে উচ্চারণ করল, 'বলছ?'

'নিশ্চয়ই বলছি!' দীপ্তি বলল, 'তাছাড়া, অতনু মুখার্জির স্ত্রীর চরিত্র একটু অন্য রকম, এটা তুমি দু' দিন চোখে দেখেই বুঝলে কেমন করে?'

'শুধু দেখি নি দীপ্তি, কথাও বলেছি।' অরূপ বলল, 'পাশাপাশি দুটো মানুষের চোখ মুখের ভঙ্গি, কথাবার্তা শুনলে, তাদের মধ্যে তফাতটা কি ধরা পড়ে না? মানুষকে দেখলে তো খানিকটা চেনা যায়। অবশ্য তোমার কথা আমি উড়িয়ে দিচ্ছি নে। হয়তো মিসেস মুখার্জি আমার সঙ্গে ছলনাই করেছেন, আমি ধরতে পারি নি।'

দীপ্তি অরূপের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। অতনু মুখার্জির স্ত্রীর প্রতি অরূপের বিশ্বাস দেখে, প্রথমে মনটা শক্ত হয়ে উঠেছিল। শেষের কথাগুলো শুনে, একটু নরম হলো। কিন্তু দৃঢ় স্বরেই বলল, 'আমি বলছি, অতনু মুখার্জির বউয়ের চালাকি তুমি ধরতে পারো নি। এ্যাম্‌বিশন কী জিনিস, তুমি জানো। লেডি ম্যাকবেথের কথা ভুলে যেও না।'

অরূপ মনে মনে অবাক হলেও, দীপ্তির কাছে তা প্রকাশ করল না। কিন্তু মিলি মুখার্জিকে, আর যাই হোক, ও লেডি ম্যাকবেথ ভাবতে পারছে না। লেডি ম্যাকবেথের এ্যামবিশন ইনস্যানিটি আর অবসেশনের পর্যায়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কেবল বলল, 'আমি এতটা অবশ্য ভাবতে পারি নি।'

'ভাবতে পারা উচিত।' দীপ্তি বলল, 'আমি ভাবতে পারছি। মিসেস মুখার্জি তোমার মনে কুহক সৃষ্টি করতে চাইছে। তোমাকে ওই মহিলার সম্পর্কেও বেশি সাবধান থাকতে হবে। তুমি যা করছ, কর, কিন্তু মিসেস মুখার্জিকে একটুও বিশ্বাস করবে না। তুমিই ভেবে দেখ না, আজ যদি

তুমি অতনু মুখার্জির মতো একটা কাণ্ড করতে, তাহলে আমার কাছে কখনো গোপন করতে পারতে ?'

অরূপ হেসে বলল, 'অতনু মুখার্জির মতো কাজ আমি কখনো করতেও পারব না। আর এও জানি, করলেও তুমি আমাকে মনে মনে ঘৃণা করবে। করবে না ?'

দীপ্তির মুখে একটু কুণ্ঠিত লজ্জার ভাব দেখা গেল। কিন্তু একটু ভেবে বলল, 'মানুষের মনের কথা কিছুই বলা যায় না। অবস্থা গতিকে মানুষের মন বদলে যায়। এখন হয়তো মনে হচ্ছে, তুমি সে-রকম কিছু করলে আমার ঘৃণাই হবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটলে, তখন তোমাকে বাঁচাবার কথাটাই আমার আগে মনে আসতে পারে।'

তার অর্থ, অরূপ অপরাধ করলেও দীপ্তি তা মেনে নিতে পারে। কেবল সেই অপরাধটা হতে হবে, নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে। দীপ্তিকে দোষ দেওয়া যায় না। এটাই হয়তো অধিকাংশ মানুষের মনোভাব। কিন্তু দীপ্তি ওর চোখে আলাদা। ও বলল, 'যাই হোক, এত সব ভেবে লাভ নেই। আমি তোমার কথা মনে রাখব, মিসেস মুখার্জির সঙ্গে সাবধানে কথা বলব।'

'আমার কিন্তু বিশ্বাস, টাকাটা যদি সত্যি অতনু মুখার্জি নিয়ে থাকে—।'

অরূপ এবার অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, 'এ কথার মানে কি, অতনু মুখার্জি যদি সত্যি টাকাটা নিয়ে থাকে ? আমি তোমাকে ছক কেটে অঙ্কের মতো প্রমাণ করে দিয়েছি, টাকাটা অতনু মুখার্জি ছাড়া আর কারোর হাতে যেতে পারে না। টাকাটা সে-ই সরিয়েছে। তুমি কি তাহলে আমাকে বিশ্বাস করছ না ?'

দীপ্তি বাধা পেয়ে থমকে গেল। ওরও মুখ শক্ত হয়ে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, অঙ্কের মতো ছক কেটে দেখিয়েছ, কিন্তু সেটা তোমার ধারণা করা ছক। প্রমাণ নয়।'

'তার মানে, কি বলতে চাও তুমি ?' অরূপ ঝেঁজেই বলল, 'টাকাটা তাহলে আমি সরিয়েছি ?'

দীপ্তি অবাক স্বরে বলল, 'তা কেন বলব ?'

'তুমি তো তাই বলতে চাইছ।' অরূপ বলল, 'দুটোর যে-কোনো একটা এক্ষেত্রে মেনে নিতেই হবে। টাকাটা যে-ভাবে সরেছে, হয় তা অতনু মুখার্জির হাতে গেছে, না হয় আমার হাতে আছে। এর মধ্যে নতুন করে আর কিছু ভাববার নেই। তোমাকে যে-কোনো একটা বিশ্বাস করতে হবে। তোমার মনে যদি সন্দেহ থাকে, অতনু মুখার্জি টাকাটা না-ও সরাতে পারে, তাহলে নিশ্চয় আমিই সরিয়েছি ?'

'আমি মোটেই তা বলতে চাই নি।' দীপ্তির মুখ লাল হয়ে উঠল।

অরূপ জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে তুমি কী বলতে চাইছ ?'

'আমি কিছুই বলতে চাইছি না।' দীপ্তির স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। চোখের কোণ জলের ফোঁটায় চিকচিক করে উঠল। ও মুখ ফিরিয়ে, আলসের গায়ে হাত রাখল।

অরূপ বিব্রত হয়ে পড়ল। মনটা ভরে উঠল অস্বস্তি আর ব্যাকুলতায়। ও ইচ্ছা করে, দীপ্তিকে কষ্ট দিতে চায় নি। একটা অপমান বোধ ওকে রুক্ষ করে তুলেছে। ও এগিয়ে গিয়ে, দীপ্তির কাঁধের ওপর একটা হাত রাখল। দীপ্তি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অরূপ দীপ্তির কাঁধে হাত রেখে, ওর পাশাপাশি গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, দীপ্তির মুখে বেলা শেষের রক্তাভা। চোখের জল গালে গড়িয়ে এসেছে। অরূপ ডাকল, 'দীপ্তি।'

দীপ্তি বাঁ হাতের পিছন দিয়ে, দু'গাল আর চোখ মুছল। কোনো জবাব দিল না। অরূপ বলল, 'তুমি আমাকে বিশ্বাস কর তো ?'

দীপ্তি কোনো জবাব দিল না। অরূপ আবার বলল, 'এটা এমন একটা ব্যাপার, এই সংসার আর মানুষকে আমি নতুন চোখে দেখতে শিখেছি। আমি জানি, আমাকে আমার বন্ধুরাও অনেকে আজ সন্দেহ করে।

বাড়িতে মা ভাই বোন ভাবে, আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে, আমার আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এ সময়ে আমার মনের জোর দরকার। সেটা আমি তোমার কাছ থেকে চাই। আমার তো এখন কারোর ওপর রাগ করারও অধিকার নেই, তোমার ওপর ছাড়া। তুমি ভুল বুঝলে, আমার আর কেউ থাকে না।'

দীপ্তি মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'আমি ভুল বুঝলে, তোমার সঙ্গে কি আর মিশতাম?'

অরূপ দীপ্তির দুই কাঁধে হাত দিয়ে, নিজের দিকে ফেরাল। দীপ্তি চোখ নামিয়ে রাখল। অরূপ এক হাতে ওর চিবুক তুলে ধরল। দীপ্তি চকিতে একবার অরূপের মুখের দিকে দেখে, আবার চোখ নামাল। অরূপ মুখ নামিয়ে ডাকল, 'দীপ্তি।'

দীপ্তি সিঁড়ির দরজার দিকে একবার দেখল। অরূপ দীপ্তিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এলো। দীপ্তি সরে গিয়ে বলল, 'এখনো দিনের আলো আছে।'

'জানি।' বলেই দীপ্তির হাত টেনে ধরে ছাদের ওপর বসে পড়ল। চারদিকে আল্‌সের আড়াল। অরূপের চোখে মুখে আবেগ। দীপ্তির ঠোঁটের কাছে ঠোঁট এগিয়ে নিয়ে এসে স্পর্শ করল।

দীপ্তির মুখে অনুরাগের আলো। কিন্তু ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে বলল, 'কী হচ্ছে? যে কেউ ছাদে উঠে আসতে পারে।'

'তুমি রাগ করছ না তো আর?'

'রাগ আমি মোটেই করি নি।'

'কষ্ট পেয়েছ। আমিই কষ্ট দিয়েছি।' অরূপ বলতে বলতেই আবার দীপ্তির ঠোঁটের ওপর নিজের ঠোঁট চেপে ধরল।

দীপ্তি মুহূর্তে প্রতিদান দিয়ে, নিজের ঠোঁট মুক্ত করে নিল। অভিমানের স্বরে বলল, 'শুধু শুধু কষ্ট দিলে। আসলে আমি কী বলতে যাচ্ছিলাম?

অতনু মুখার্জি যখন টাকাটা নিয়েছে, তখন তা আর তার কাছে নেই। তার বউয়ের হাতেই চলে গেছে। বউ টাকাটা কলকাতায় সরিয়ে ফেলেছে কী না, সেটাই তোমাকে ভেবে দেখতে বলছিলাম।'

'বলো না দীপ্তি. তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে গেছে!' অরূপের চোখে উদ্বেগ, স্বরে গভীর উৎকণ্ঠা।

দীপ্তি বলল, 'আমি সেটাই তোমার মাথায় ঢোকাতে চাইছি। তুমি তো কেবল অতনু মুখার্জির ওপরে চোখ রেখেই খালাস। আর একটা দিক দেখছ না।'

অরূপ আদৌ মিলি মুখার্জির দিক থেকে চোখ সরিয়ে রাখে নি। কিন্তু অতনু চরিত্র যদি ও ঠিক বুঝে থাকে, তবে এটাও নিশ্চিত, সে তার স্ত্রীর কাছে কখনোই টাকাটার কথা স্বীকার করে নি। তবে তা নিয়ে দীপ্তির সঙ্গে আলোচনা নিরর্থক। কারণ ও মিলি মুখার্জিকে বিশ্বাস করে না।

এই সময়ে দীপ্তির বারো বছরের ছোট বোন ছাদে এলো। বলল, 'দিদি, মা তোমাদের নিচে আসতে বলল, অরূপদার জন্য মা চা করেছে!'

দুজনেই উঠে দাঁড়াল।

১০

জীবনটা বড় আঁকাবাঁকা। সে কখনো সোজা পথে চলে না। মানুষের জীবনের ইতিহাসের গতিটা বরাবরই এ রকম। দীপ্তি যে মিলি মুখার্জিকেই সব থেকে বেশি অবিশ্বাস করছে, সেটা কেবল ওর যুক্তি নয়। নারীর মনের এটাই বৈশিষ্ট্য, সে আর এক নারীকে সহজে বিশ্বাস করতে পারে না। আরও একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, মিলি মুখার্জির প্রতি অরূপের বিশ্বাসটাই, দীপ্তির মনে ঈর্ষার সঞ্চার করেছে। বুদ্ধিমান অরূপ সেটা বুঝতে পেরেই, আর বিতর্কে যেতে চায় নি।

অরূপ বুধবার অফিসের কাজে যোগদান করল। ইউনিয়নের সমর্থন ওর পক্ষে ছিলই। কর্তৃপক্ষও ওকে অবিশ্বাস করে নি। পুলিশের রিপোর্টও সন্তোষজনক ছিল। তবু, কাজে যোগদান করার সময় ওকে মুচলেকা দিতে হলো, খোয়ানো লাখ টাকা ওকে সুদসুদ্ধ মাইনে থেকে শোধ দিতে হবে। ইউনিয়ন বলল, আপাততঃ তারা এই শাস্তি মেনে নিচ্ছে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেই, এ বিষয়ে ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে আরজি পেশ করবে।

অরূপ বন্ধুদের সমবেদনায় কৃতার্থ। কিন্তু ওর মনের গতি তখন অন্য দিকে। ভেবেছিল, বুধবারই সন্ধেবেলা অতনু মুখার্জির কোয়াটারে যাবে। কিন্তু দুটো দিন সময় নিল। ও শুক্রবার সন্ধ্যায় অতনু মুখার্জির কোয়ার্টারের দরজায় এসে দাঁড়াল। হাতে এক প্যাকেট মিষ্টি। কলিং বেলের বোতাম টিপল। ভিতরে কলিং বেল বাজার শব্দ শোনা গেল। মিনিট খানেক পরেই, যতীন এসে দরজা খুলে দিল। অরূপ বলল, 'মিঃ মুখার্জি আছেন।'

'না, সাহেব এখনো অফিস থেকে আসেন নি।' যতীন বলল।

অরূপের মনে আশা নিরাশার দোলা। বলল, 'মিসেস মুখার্জি আছেন?'

'আছেন।'

'তা হলে, তাঁকে একটু বলতে হবে, অরূপ ঘোষাল দেখা করতে এসেছে।'

যতীন অরূপের দিকে একবার দেখল। আর একবার তার হাতের মিষ্টির প্যাকেটের দিকে। দরজাটা ভেজিয়ে দিতে দিতে বলল, 'দাঁড়ান।'

প্রায় দু' মিনিট পরে, ভেজানো দরজা আবার খুলে গেল। সামনে মিলি মুখার্জি দাঁড়িয়ে। অরূপকে দেখেই, হেসে বলল, 'আপনি। আসুন, ভেতরে আসুন।' অরূপ তার আগেই দু' হাত কপালে ছুঁইয়েছে। কিন্তু কিছু বলবার অবকাশ পেল না। মিলির ডাকে ভেতরে ঢুকল। মিলি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে, বারান্দার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। তার ঘাড় ছাঁটা চুল আঁচড়ানো। লাল পাড় হলুদ শাড়ির সঙ্গে হলুদ জামা। প্রসাধন করে নি বললেই চলে। অরূপকে বলল, 'বসুন। মিঃ মুখার্জি এখনো ফেরেন নি। কোনো কারণে আটকে গেছেন। এখুনি এসে পড়বেন। বসুন আপনি।'

অরূপ না বসে, মিষ্টির প্যাকেটটা টেবিলের ওপর রাখল। দীপ্তির কথাগুলো ওর মনে পড়ল। আর মন তার দৃষ্টি সজাগ রাখল। মুখে ওর নম্র কুণ্ঠিত হাসি।

মিলি অবাক হয়ে মিষ্টির প্যাকেট দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী?'

'একটু মিষ্টি।' অরূপ লজ্জিত সংকোচে বলল।

মিলি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'আমি আজ ব্যাঙ্কে জয়েন করেছি।'

'আপনাকে কাজে নিয়েছে!' মিলির দুই চোখ অবাক খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'বাঃ, সত্যি খুব খুশি হলাম। কিন্তু সেই টাকাটার ব্যাপারে কী হলো?'

অরূপ বিষণ্ণ হেসে বলল, 'সেটার জন্য আমাকে মুচলেকা দিতে হয়েছে, সুদসুদ্ধ টাকাটা আমার মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হবে।'

'ইস! এটা শুনে সত্যি খারাপ লাগছে।' মিলির মুখে বিষণ্নতার ছায়া নামল, 'অথচ অথরিটি তো জানে টাকাটা আপনি নেন নি।'

অরূপ বলল, 'তা হয় তো বিশ্বাস করেছে। কারণ পুলিশ রিপোর্ট স্যাটিস-ফ্যাক্টরি ছিল। কিন্তু অথরিটি টাকাটা তো ছাড়বে না।'

'মাসে কত পার্সেন্ট কাটবে মাইনে থেকে?' মিলি অস্বস্তিতে জিজ্ঞেস করল।

অরূপ বলল, 'প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি।'

'আঃ! ভাবতেই খারাপ লাগে।' মিলি বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন। কিন্তু এই মিষ্টি কেন?'

অরূপ কুণ্ঠিত হেসে বলল, 'চাকরিটা পাবার কোনো আশাই তো ছিল না। তবু ফিরে পেয়েছি। আমি খবরটা আপনাদের দেব বলেছিলাম। তাই একটু—'

'না না, এটা আপনি ঠিক করেন নি অরূপবাবু।' মিলি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'আপনি অনেস্ট ছেলে, চাকরি ফিরে পেয়েছেন, সেটা হয়তো মন্দের ভালো। কিন্তু মিষ্টি খাওয়াবার মতো সুখের খবর এটা মোটেই নয়। এটা আপনি ঠিক করেন নি। ও মিষ্টি ভাই আমার গলা দিয়ে নামবে না।'

অরূপ মিলির চোখের দিকে চকিতে একবার দেখল। মিলি কি সত্যি ছলনাময়ী? বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। ও সংকুচিত হয়ে বলল, 'দেখুন …কী বলব—আপনাকে আমার দিদির মতোই বলা যায়। জানি, আমার জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তবু তো বড় বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেছি। চাকরিটাও ফেরত পেয়েছি। সেটাই আমার কাছে অনেকখানি। এ খবরটা দিতে এসে, ওটা না নিয়ে এসে পারলাম না।'

'দিদির মতোই যখন ভাবছেন, তখন এটাও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, এ মিষ্টি আমার কাছে কী রকম কষ্টের?' মিলি করুণ হেসে বলল, 'ঠিক আছে। বসুন তো। একটু চা করতে বলি।'

অরূপ বলল, 'মিঃ মুখার্জি আসুক না। তারপরে চা হবে।'

'তবে তাই হবে। ও এখুনি এসে পড়বে। ততোক্ষণ আপনার সঙ্গে একটু গল্প করি।' মিলি চেয়ারে বসল।

অরূপও বসল। মিলি কথায় কথায় অরূপের বাড়ির কথা তুলল। খোঁজ নিল কে কে আছে। অরূপ সবই বলল। এমন কি, ওর প্রতি বাড়ির সকলের মনোভাবের আভাসও একটু দিল। মিলি আহত বোধ করল। তারপরে জানতে চাইল, অরূপের বিয়ে হয়েছে কী না। অরূপ লজ্জিত হেসে জানাল, সেটাও ওর জীবনে একটা দুর্দৈবের রূপ নিয়ে এসেছে। মিলি কৌতূহলিত হলো। অরূপ দীপ্তির কথা বলল। কিন্তু একটু মিথ্যা কথা বলল, দীপ্তি এ ঘটনার পরে, ওকে আর বিয়ে করতে রাজি না।

'এটা খুব অন্যায়।' মিলি দৃঢ় স্বরে বলল, 'এতদিন দেখেও কি দীপ্তি আপনাকে চিনতে পারে নি? এত সহজে এতদিনের সম্পর্ক নাকচ করে দিল।'

অরূপ করুণ বিষণ্ণ মুখে চুপ করে রইল। মিলি বলল, 'আমি দীপ্তির সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে চাই। আপনি নিয়ে যাবেন?'

অরূপ মনে মনে শংকিত হলো। বলল, 'লাভ নেই।'

'তা বলা যায় না ভাই। আমি একবার আপনার দীপ্তির সঙ্গে দেখা করতে চাই।' মিলি বলল, 'আপনার মা বোনদের সঙ্গেও আলাপ করতে চাই।'

এই সময়ে কলিং বেল বেজে উঠল। মিলি উঠে দাঁড়াবার আগেই, যতীন ছুটে বেরিয়ে এসে, বাইরের দরজা খুলে দিল। অতনু মুখার্জি ঢুকল। কয়েক পা এগিয়ে এসেই, অরূপের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখে মুখে একটা চমকানো উদ্বেগ। বলে উঠল, 'কে?'

অরূপ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মিলি অবাক হয়ে বলল, 'কে আবার? অরূরবাবু। তুমি অমন চমকে উঠলে কেন?'

অতনু তবুও তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে উঠতে পারল না। সে বেশ খোস

মেজাজে ঢুকেছিল ? তারপরেই হঠাৎ যেন, সাপ দেখার মতো চমকে উঠেছে। প্রায় তোত্‌লার মতো বলল, 'মানে মানে, ইয়ে—।'

'আশ্চর্য !' মিলি ভ্রূকুটি বিস্ময়ে বলল, 'অরূপবাবুকে ভুলে গেলে তুমি ? গত রোববার সকালে এসেছিলেন।'

অতনুর ঠোঁট শুকিয়ে গিয়েছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে মনে মনে বলল, 'খুব চিনেছি। একে কখনো ভুলতে পারি ? কিন্তু আবার কেন ? চাকরির উমেদারিতে ?'...তারপরেই হেসে বলল, 'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। আসলে এত আনমাইণ্ডফুল ছিলাম। অফিসে আজ খুব খাটাখাটনি গেছে।' সে তার নিজেকে ফিরে পেল। স্মার্ট ভঙ্গিতে টেবিলের সামনে এগিয়ে এলো।

মিলি বলল, 'অরূপবাবু ব্যাঙ্কের চাকরিটা ফিরে পেয়েছেন। সে খবর দিতে এসেছেন আমাদের।'

'ইজ ইট !' অতনু যেন খুবই খুশি হয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে বলল, 'কংগ্রেচুলেশন !'

অরূপ ওর হাতটা এগিয়ে দিল। অতনু অরূপের হাত ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু মিলি চাকরি পাওয়ার শর্তটা বলল। অতনু বলল, 'সেটার কোনো উপায় নেই মিলি। আজ যদি আমার স্টাফের মাইনের টাকা আমার হাত থেকে খোয়া যায়, তা হলে কি কোম্পানি আমাকে ছেড়ে দেবে ?'

'খোয়া যাওয়া, আর চুরি করা তো এক কথা নয়?' মিলি বলল, 'অরূপবাবু তো চুরি করেন নি। কোথাও একটা ভুল হয়েছে।'

অতনু ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসে বলল, 'ভুলের মাশুল দিতে হয় মিলি, রেহাই পাওয়া যায় না। কী বলেন অরূপবাবু, ভুল বলেছি ?'

অরূপ মাথা নেড়ে বলল, 'না, ঠিকই বলেছেন। ভুলের মাশুল দিতেই হয়।'

'এটা কি নিয়তি নাকি ?' মিলি বলল, 'আমি তো জানি, ক্রাইম ডাজ নট পে। অপরাধীকে ধরা পড়তেই হয়।'

অরূপ দেখল, অতনুর মুখটা মুহূর্তেই যেন পাংশু হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ—মানে, তোমার কথাও সত্যি। কিন্তু চাকরির ব্যাপারে—বিশেষ করে টাকা পয়সার ব্যাপারে ভুল চুক হলে, রেহাই পাওয়া যায় না। যাই হোক, অরূপবাবু, আপনি চাকরিটা ফেরত পাওয়ায় আমি খুব স্বস্তি বোধ করছি। সত্যি বলতে কি, ব্যাঙ্কে আপনি কেটে কুটেও যা পাবেন, চটকলে তাও পেতেন কি না সন্দেহ। আই অ্যাম হ্যাপি।'

'কিন্তু অরূপবাবুর ওপরে আমি খুব রাগ করেছি!' মিলি বলল, 'উনি আমাদের জন্য মিষ্টি নিয়ে এসেছেন।'

অতনু গম্ভীর হয়ে বলল, 'এটা সত্যি আপনি ঠিক করেন নি অরূপবাবু।'

'তবে উনি আমাকে দিদির মতো ভাবেন বলেই, খবরটা দেবার জন্য মিষ্টি এনেছেন।' মিলি বলল, 'বোঝেন না, দিদিদের মনে কী কষ্ট হয়! আমি ঠিক করেছি। অরূপবাবুদের বাড়ি একদিন যাব।'

অতনুর মুখে উদ্বেগের ছায়া দেখা গেল। বলল, 'কেন ?'

'সে সব কথা পরে বলব।' মিলি হেসে বলল, 'তুমি কি হাত মুখ ধুয়ে আসবে ? না এখনই একটু চা খেয়ে নেবে ?'

অতনু বলল, আমাকে একটু ক্লাবে যেতে হবে মিলি। তোমারও নেমন্তন্ন আছে।'

'কী ব্যাপার ?' মিলির চোখে ভ্রূকুটি প্রশ্ন।

অতনু হেসে বলল, 'ঘোষ এতদিন এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পোস্টে অফিসিয়েটিং করছিল। আজ তার সেই পোস্টে কনফারমেশন হয়ে গেল। একদিন ভালো করে পার্টি দেবে। আজ একটু ছোট-খাটো করে ক্লাবে বসা হবে।'

'তার মানেই গুচ্ছের ড্রিংক করা।' মিলি ঠোঁট কুঁচকে বলল, 'আমার ইচ্ছে নেই।'

অতনু বলল, 'আহা চল না। তুমি না হয় একটা ড্রিংক নিয়ে বসবে, আর গল্প করবে।'

'মাতালদের সঙ্গে ক্লাবে আমার গল্প করতে ইচ্ছে করে না।' মিলি বলল, 'মিসেস ঘোষও প্রচুর ড্রিংক করেন। যাও তুমি তৈরি হয়ে এসো, আমি চা দিতে বলি।'

অতনু ভিতরে চলে গেল। অরূপকে দেখে যেমন সাপ দেখার মতো চমকে উঠেছিল, এখন আর তা নেই। ক্রমেই চারদিক বেশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। অরূপের চাকরি হয়ে যাওয়া মানে, লাখ টাকার ব্যাপারটার ওখানেই ইতি। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, সেই লাখ টাকার বাণ্ডিল। গত-কাল ও দেখেছে, হাত বুলিয়েছে। ঠাণ্ডা, মসৃণ অথচ এক আশ্চর্য স্পর্শের অনুভূতি! কিন্তু খুব সাবধান! একটি একটি করে হাজার টাকার নোট খুলে আনতে হবে। ভাঙাতে হবে চারদিকে চোখ রেখে। তারপরে সেই ভাঙানো টাকা বিভিন্ন ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। অরূপের কথা ভাবলে মনটা একটু খারাপ হয়। কিন্তু ভুলের মাশুল তো দিতেই হবে। সে সিস দিতে দিতে বাথরুমে ঢুকে গেল।

অতনু যখন পোশাক বদলে বারান্দায় এলো, তখন চা এসে গিয়েছে। সঙ্গে কিছু সামান্য খাবার। মিলি অরূপের আনা মিষ্টি নিজের হাতেই তুলে নিয়েছে। অতনু এসে বসল। মিলি তাকে চা দিল। অতনু বলল, 'ক্লাবে যাবে তো?'

'আমি ভাবছিলাম, অরূপবাবুর সঙ্গে গল্প কবব।' মিলি বলল, 'ওকেও ক্লাবে নিয়ে যেতে পারি নে?'

অতনু চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেল। তারপরেই একটু কেসে, আমতা

আমতা করে বলল, 'তা—মানে ক্লাবে নিয়ে যাবে বলছ ?'

'হ্যাঁ, তোমরা ড্রিংক করবে, আমরা গল্প করব।' মিলি বলল, 'যেতে তো কোনো বাধা নেই।'

অরূপ অস্বস্তির ভাব দেখিয়ে বলল, 'থাক না, আপনারা যান। আমি বরং আর একদিন আসব।

'চলুন না।' 'মিলি বলল, 'চটকল সাহেবদের সাহেবি দেখবেন। মজাই লাগবে। আমার কর্তার কথা অবশ্য আলাদা, ও ক্লাবে গিয়ে মোটেই রাউডি হয়ে যায় না, আর ভুল ইংরেজিতে কথাও বলে না।' বলে হেসে অতনুর দিকে তাকাল।

অতনু ইতিমধ্যে মনে মনে ঠিক করে ফেলল, মিলিকে বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। সবই স্বাভাবিক থাক, সুচারু ভাবে চলুক। কোথাও কোনো সন্দেহের অবকাশ না রাখাই ভালো। সে বলল, 'বেশ তো, চলুন অরূপ-বাবু, আপনি মিলির সঙ্গে সফট্ ড্রিংক নিয়ে বসে গল্প করবেন।'

অরূপ এটাই মনে প্রাণে প্রার্থনা করছিল। ভেবে পাচ্ছিল না, ক্লাবে যাবার সুযোগটা কেমন করে আসবে। এখান থেকে যদি কোনো রকমেই সম্ভব না হতো, ওকে মিঃ হাজরার সাহায্য নিয়ে ক্লাবে যেতে হতো। কিন্তু যেতেই হতো। এটা ছিল ওর শিকার ধরার সব থেকে কঠিন তপস্যা। তা যে এমন অনায়াসে ঘটে যাবে, আর আজই, ভাবতে পারে নি। আশাও করে নি। এখনো যেন বিশ্বাস হচ্ছে না, ও সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত ক্লাবে যাচ্ছে। কিন্তু কেবল গেলেই হবে না। তার পরেও অনেক কাজ আছে। কঠিনতম কাজ। সেটা নিশ্চয়ই একদিনে সম্ভব হবে না।

'কী ভাবছেন অরূপবাবু ?' মিলি জিজ্ঞেস করল।

অরূপ সচকিত হয়ে বলল, 'না, তেমন কিছু না। আপনারা যাচ্ছিলেন নিজেদের বন্ধুর নিমন্ত্রণে—।'

'তাতে ক্লাবে যেতে দোষ কি।' মিলি বলল, 'আমরা তো এমনিতেই যেতে

পারতাম। তাই না।' সে অতনুর দিকে তাকাল।

অতনু বলল, 'হ্যাঁ, ক্লাবে আমরা আমাদের যে কোনো গেস্টকেই নিয়ে যেতে পারি। মিলি, তুমি তৈরি হয়ে নাও।'

'তৈরি তো হয়েই আছি।' মিলি বলল, 'আর সাজগোজের দরকার নেই। ছায়া মিউকে নিয়ে বেরিয়েছে। নিচে নামলেই দেখা হয়ে যাবে।'

অতনু মিলিকে একবার দেখল। বলল, 'একটু কিছু বুলিয়ে-টুলিয়ে নেবে না?'

'বাব্বা! মিলি হেসে বলল. 'তোমার সব দিকে নজর। আসছি।'

মিলি ভিতরে গেল। অতনু হাসল। মন তার নিশ্চিন্ত। কোথাও কোনো রকম অস্বস্তি বা সন্দেহ নেই। অরূপ নিজে ক্লাবে যেতে চাইলে, সন্দেহের কারণ থাকত। কিন্তু তা সে চায় নি। মিলিকেও দোষ দেওয়া যায় না। সরল মনেই প্রস্তাবটা করেছে। তা ছাড়া আর যেটা সন্দেহ হতে পারে, সেটা অবিশ্বাস্য। মিলি কখনোই এই সামান্য অরূপ ঘোষালের প্রেমে পড়বে না। যে কি না, ব্যাঙ্কে লাখ টাকা খুইয়ে, বিপদে পড়ে অতনুর কাছেই চাকরি চাইতে এসেছিল। সে অরূপকে সান্ত্বনা দেবার মতো করে বলল, 'ক্লাবে গিয়ে আপনার অস্বস্তি হতে পারে। গায়ে মাখবেন না। আর একটা কথা, আমার মনে হয়, আপনি যে সেই ব্যাঙ্ক কর্মচারি, পরিচয় দিতে গিয়ে সেটা না বলাই ভালো।'

মিলি এ সময়েই এসে পড়ল। দেখেই বোঝা গেল, সে ঠোঁটে লিপস্টিক বুলিয়েছে। চোখে ও ভুরুতে টেনেছে কালো পেন্সিল। চোখের পাতায় আই-সাটার। অল্প একটু প্রলেপ। চুলটা আর একটু ধাতস্থ করা। দু' মিনিটেই সেরেছে। জিজ্ঞেস করল, কী বলছ?'

অতনু বলল কথাটা। মিলি বলল, 'ও সব কথা বলার কি দরকার? গেস্ট ইজ গেস্ট। না হয় বলে দেব, আমার ভাই।'

'হ্যাঁ সেটাই ভালো। অতনু হেসে মিলিকে তারিফ করল, 'বেকার ভাই।

কি চাকরি-বাকরি করে, তাও বলার দরকার নেই। চল যাওয়া যাক। উইক-ডে পার্টি, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।' সে চেয়ার ছেড়ে উঠে সিগারেট ধরাল।

মিলি বলল, 'আমি তো ঘণ্টা খানেক থেকে চলে আসব। তুমি বেশি রাত করলে, তোমারই অসুবিধে, কাল ভোরে উঠে অফিসে যেতে পারবে না। আসুন অরূপবাবু।'

অরূপ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভাই-ই যখন বলবেন, তখন বাবুটা এখানেই বাতিল করে যান। আমি কিন্তু দিদি বলেই ডাকতে পারি, অবশ্যই অনুমতি পেলে।'

মিলি মনের দিক থেকে আপস্টার্ট নয়। কেউ দিদি বললেও, ও নিজেকে বুড়ি ভাবে না! বলল, 'তাই হবে। আগে ক্লাবে যাই।'

অতনু আগে চলল। পিছনে মিলির সঙ্গে অরূপ। অরূপের বুক দুরু দুরু করছে। নিচে নেমে, একটা ব্লক ছাড়িয়ে, বাঁদিকে গেল। সামনেই টেনিস লন। যার পাশে সবুজ ঘাসের মাঝখানে, সিমেন্টের দ্বীপ। টেনিস লনের, ওপারে ক্লাব ঘর। আলো জ্বলছে চারদিকে। টেনিস কেউ খেলছে না। ক্লাব বাড়িটি বেশ বড়। সিঁড়ি দিয়ে সামনে উঠে, সুদীর্ঘ লম্বা বারান্দা। সামনে একটি মাঝারি ঘর। তার পরেই বড় হলঘর। সেখানে বেশ কিছু টেবিল ঘিরে চেয়ার। একপাশে একটা পিয়ানো। শেষ প্রান্তে উঁচুতে বার। সেখানেও বসবার আলাদা ব্যবস্থা আছে। বারে আলমারিতে নানা রঙের আর আকারের বোতল সাজানো।

এক জায়গায় একটা বড় টেবিল ঘিরে কিছু মহিলা পুরুষ বসে ছিলেন। সেখান থেকে ডাক ভেসে এলো, 'হ্যালো মুখার্জি, এদিকে।'

অতনু একবার পিছনে মিলিকে দেখে, সেদিকে এগিয়ে গেল। মিলি অরূপকে ডাকল 'আসুন।'

মিলিকে দেখে, ভদ্রলোকেরা সব উঠে দাঁড়ালেন। একজন বললেন, 'আসুন

মিসেস মুখার্জি। বসুন।'

মিলি সেই ভদ্রলোককে বলল, 'কংগ্রেচুলেশন মিঃ ঘোষ। কিন্তু এভাবে তো হবে না।'

'নিশ্চয়ই নয়। মুখার্জিকে তো বলেছি, আমার কোয়ার্টারে আলাদা করে হবে।' মিঃ ঘোষ বললেন।

এক মহিলার হাতে পানীয়র গেলাস। মিলিকে বললেন, 'আমার কাছে আসুন মিসেস মুখার্জি।'

'আপনি বসুন মিসেস ঘোষ। আজ তো আপনারই দিন।' মিলি একটা চেয়ারে বসতে বসতে অরূপকে পাশের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল।

অনেকেই অরূপের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। বোধহয় তার মুখে গোঁফ দাড়ির জন্যই, নজরটা বেশি পড়ছিল। মিলি সকলের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমার ভাই, অরূপ। ও এসে পড়েছে, তাই ওকেও নিয়ে এলাম। নইলে একলা ঘরে বসে থাকতে হতো।'

মিসেস ঘোষ বললেন, 'বেশ করেছেন। আসুন অরূপবাবু, বসুন।'

একজন মিলির দিকে হুইস্কির গেলাস এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার ভাইকে কি দেব? হুইস্কি?'

'না না, আমি ও সব খাই না।' অরূপ নম্র বিনয়ে বলল।

মিলি বলল, 'আমিও ভাবছিলাম হুইস্কি খাব না আজ। সপ্তাহে একদিন এক পেগ আমার কোটা।'

'প্লিজ ম্যাডাম. সেলিব্রেট দ্য ডে উইথ আস ফর মিঃ ঘোষ।' একজন বলল।

মিলি বলল, 'ঠিক আছে। অরূপকে একটা সফ্‌ট ড্রিংক দিতে বলুন।'

বার বেয়ারার ওপর কেউ নির্ভর করে নেই। টেবিলের ওপর হুইস্কি রাম জিনের বোতল বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোডা, থাম্পস আপ। লাইম করডিয়েল আর জলের বোতল রয়েছে। একজন গেলাসে থাম্পস আপ

ঢেলে অরূপকে এগিয়ে দিল। অরূপ গেলাস নিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ।'
'নো মেনশন প্লিজ।' বলে সে ভিড়ের মধ্যে চেয়ারে বসল।
কয়েকজন চেয়ার সরিয়ে নিয়ে এসে মিলির কাছে বসল। অরূপ ক্লাবের চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল। তার আগে দেখে নিল অতনুকে। সে তখন হুইস্কির গেলাস নিয়ে মেতে গিয়েছে। বসেছে এক মহিলার পাশে, আর ইংরেজিতে বকবক করছে।
অরূপ ভাবছে, ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে, অতনু প্রথম ক্লাবে ঢুকেছিল। কোন্ দরজা দিয়ে ঢুকেছিল? যে-দরজা দিয়ে অরূপ ঢুকল, সেই দরজা দিয়ে? তা হলে গাড়ি কোথায় রেখেছিল? সামনে তো টেনিস লন। অন্য দিক দিয়ে ঢুকেছিল কি? পিছন দিকে দরজা থাকতে পারে। কিন্তু এই হলে বসে, কিছুই বোঝা যায় না। কোথা থেকে খট্‌খট্ শব্দ আসছিল। আর বেশ কিছু কলরব। শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল টেবিল টেনিস খেলা হচ্ছে। কিন্তু কোন্ ঘরে? কোথায়?
'কী হলো অরূপ?' মিলি অনায়াসেই অরূপের নাম ধরে ডাকল। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'অস্বস্তি হচ্ছে?'
অরূপ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না, দেখছি। কোথাও বোধহয় টেবিল টেনিস খেলা হচ্ছে।'
'হ্যাঁ ওই ঘরে। দরজাটা বন্ধ আছে।' মিলি ডানদিকে একটা বন্ধ দরজা দেখিয়ে বলল, 'তুমি দেখতে যাবে?'
অরূপ লজ্জিত হাসল। মিলি বলল, 'যাও না। আমাদের কোয়ার্টারের ছেলেরাই খেলছে। ওদিকে বিলিয়ার্ড রুম। একটা লাইব্রেরিও আছে। তবে বাংলা বই সেখানে নেই। কিন্তু কিছু পুরনো ভালো ইংরেজি বই আছে। বাকি সবই রাবিশ। যত রাজ্যের বাজে ইংরেজি বইতে ঠাসা। অবশ্য কিছু জুট এ্যাণ্ড টেক্সটাইল টেকনোলজির ওপরে বই আছে। সে সবে তোমার নিশ্চয়ই ইন্টারেস্ট নেই?'

অরূপ সলজ্জ হেসে বলল, 'আমি বইয়ের পোকা। আমার সব বিষয়েই ইন্টারেস্ট আছে।'

হঠাৎ কে কি বলতেই, মিলি সেদিকে ফিরল। কী একটা হাসির কথায়, সবাই হেসে উঠল। মিলিও কথায় মেতে গেল। কিন্তু অরূপ লক্ষ্য করেছে, মিলি গেলাসে একবার মাত্র চুমুক দিয়েছে। কেন? অরূপের ওপর নজর রাখবার জন্য? অবশ্য সে বলছিল, সপ্তাহে এক পেগ তার কোটা।

মিলি আবার অরূপের দিকে তাকাল, বলল, 'বাঁদিকের বন্ধ দরজাটা হলো লাইব্রেরি। কেউ বিশেষ যায় না। তুমি টেবিল টেনিস দেখতে যাবে তো চল, আমিই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

'না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না।' অরূপ নিজেই ব্যস্ত হয়ে বাধা দিল, 'আমি বেশ আছি।'

মিলি বলল, 'তুমি মোটেই বেশ নেই। চল, খেলা দেখবে।'

মিলি উঠে দাঁড়াল। অরূপ এক চুমুকে ওর পানীয় গিলে নিল। মিলি মিসেস ঘোষকে বলল, 'আমি অরূপকে টেবিল টেনিসের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আসি।'

অতনু এই সময়ে মুখ তুলে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'আসছি, টেবিল টেনিসের ঘর থেকে।' মিলি আঁচল উড়িয়ে এগিয়ে গেল। অরূপ তার পিছনে পিছনে গেল। যাবার আগে দেখল, অতনুর নেশার আমেজে একটা অস্বস্তির ছায়া। মিলি হলের ডানদিকে গিয়ে, একটা বন্ধ দরজা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল। চৌদ্দ থেকে ষোল বছরের দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে টেবিল টেনিস খেলছে। দর্শকের দল যারা বেঞ্চিতে বসে আছে, তাদের বয়সও দশ থেকে ষোলর মধ্যে। অরূপ বুঝতে পারল, মিল স্টাফের ছেলেমেয়ে এরা। ওরা মিলি অরূপকে দেখল। মিলি বলল, 'তুমি দেখ, যখন ইচ্ছে হবে চলে এসো। তোমাকে সত্যি সত্যি নাম ধরে ডাকতে আরম্ভ করেছি।'

অরূপ বলল, 'সম্পর্কটা পাতানো হয়ে গেল। আমিও এখন থেকে দিদি বলব।'

'বেশ, তাই বলবে।' মিলি বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

মিলি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল। অরূপ অস্বস্তি বোধ করল। ছোটদের মাঝখানে ও মূর্তিমান বেসামাল। সবাই ওকে অবাক হয়ে দেখছে। যারা খেলছে, তারাও। অথচ অরূপের আসল লক্ষ্য তো খেলা দেখা নয়। চোখ তুলে ও দেখল, পাশের ঘরে যাবার দরজাটা খোলা। সেই ঘরে বিলিয়ার্ডের বোর্ড দেখা যাচ্ছে। ও পায়ে পায়ে সেদিকে গেল। আর ভাবতে লাগল, লেডিজ ড্রেসিং রুমটা কোন্ দিকে? অতনু লেডিজ ড্রেসিং রুমেই প্রথম ঢুকেছিল। অরূপ বিলিয়ার্ড রুমে যেতেই, উর্দি পরা বেয়ারা টুল থেকে উঠে দাঁড়াল। অচেনা অরূপকে দেখে সেলাম ঠুকবে কি না, বোধ হয় তাই ভাবল,। অরূপ বুঝল, লোকটি মার্কার। কিন্তু বিলিয়ার্ড রুমে খেলবার কেউ নেই। বিলিয়ার্ড রুমের বাঁ পাশের খোলা দরজা দিয়ে, বার দেখা যাচ্ছে। মার্কার ওর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত সে বলেই ফেলল, 'খেল্‌নেকে লিয়ে কোই সাব নেহি আয়া। আপ্ কৌন্ কুঠি সে আ বহেঁ?'

অরূপ হিন্দিতে বুঝিয়ে দিল, ও সেল মাস্টার মিঃ মুখার্জির মেমসাহেবের ভাই। অতএব, সেলাম পেতে দেরি হলো না। অরূপ জিজ্ঞেস করল, 'সাহেব-দের বাথরুমটা কোথায়?

মার্কার বিলিয়ার্ড রুমেরই একদিকে একটা দরজা দেখিয়ে বলল, 'ওহি হ্যায়।'

অরূপ দরজা দেখে বুঝল, পুরুষদের লেভেটরিটা বারের পিছন দিকে। মার্কারকে জিজ্ঞেস করা যায় না, লেডিজ ড্রেসিং রুমটা কোন্ দিকে। ও আপাততঃ জেন্টস লেভেটরিতে ঢুকে পড়ল। রাজকীয় লেভেটরি, আয়তনের দিক থেকে। তবে তেমন ঝকঝকে নেই। সাদা পাথরের মেঝে

ঝকঝকে নয়। বড় আয়নাটার গায়ে দাগ পড়েছে। লেভেটরির পাশেও একটা ঘরের দরজা রয়েছে। ভিতরে ঢুকে দেখল, সেখানে একটা ড্রেসিং টেবল। টেবলটার বড় দুর্দশা। আয়নাটা ফাটা, টেবলে ধুলো। সাহেবদের ব্যবহারের অবকাশ নেই। অতএব পরিষ্কারও হয় না। অতনু মুখার্জি ক্লাবের সেক্রেটারি। সে বোধহয় বাথরুমে ফিনাইল ছড়াবার নির্দেশ দিয়েই খালাস।

ড্রেসিং রুমে একটা ছোট দরজা বন্ধ। অরূপ বন্ধ দরজার ছিটকিনি খুলল। দরজা খুলতে দেখা গেল, খানিকটা খোলা জায়গা। মেহেদীর বেড়ার ওপারে, কোয়ার্টারে ঢোকবার পিছনের গেট। এ গেট দিয়ে কি অতনু ঢুকেছিল? তাতে কিছু যায় আসে না। লেডিজ ড্রেসিং রুমটা দেখা দরকার। অতনু পুরুষদের বাথরুমে ঢোকে নি। ক্লাবের বেয়ারা তাই বলেছিল। বেয়ারার সঙ্গে অতনুর যোগসাজস থাকতে পারে কি? বোধ হয় না। এতটা ঝক্কি সে নিতে সাহস পাবে না। অরূপ দরজা বন্ধ করে, বিলিয়ার্ড রুমে ফিরে এলো।

অরূপ আর টেবিল টেনিসের ঘরে ফিরে গেল না। বারের দিকে গেল। বারের নিচেই হলঘর। কাঠের সিঁড়ি রয়েছে হলঘরে নেমে যাবার জন্য। কনফার্মড এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মিঃ ঘোষের জমে ওঠা পার্টি দেখা যাচ্ছে। অতনু পিছন ফিরে বসে আছে এক মহিলার পাশে। বকবক করছে। মিলির দু'পাশে দুজন পুরুষ তার মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে।

অরূপের দিকে বার বেয়ারা তাকাল। অরূপ কাঠের সিঁড়িতে পা দিয়ে, হলে নেমে, ডানদিকে তাকাতেই দেখতে পেল, 'লেডিজ ক্লোক রুম' লেখা রয়েছে একটা দরজার গায়ে। ওর বুকের স্পন্দন বেড়ে উঠল। তার মানে, ওটাই লেডিজ ড্রেসিং রুম! কিন্তু অরূপের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। ও বাঁদিক ঘেঁষে এগিয়ে গেল। চোখ ডানদিকে। লেডিজ ক্লোক রুমের

পরেই, আর একটা দরজার গায়ে লেখা আছে, 'লাইব্রেরি এ্যাণ্ড রিডিং রুম'। দরজাটা হলের দিক থেকে বন্ধ। লেডিজ ড্রেসিং রুমের পিছনে একবার যাওয়া যায় না ?

অরূপ হলে ঢোকবার বড় দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অতনু বা মিলি, কেউ ওকে লক্ষ্য করছে না। অতনু ক্রমে মাতাল হয়ে উঠছে। মিলিকে ব্যস্ত রেখেছে অন্যরা। অরূপ বড় দরজা দিয়ে হলের বাইরে এলো। চওড়া বারান্দা, সামনে টেনিস লন। ও দিক ঠিক করে, ডানদিকে গেল। ডানদিকে গিয়ে বারান্দা আবার ডানদিকেই মোড় নিয়েছে। হিসাব মতো এদিকেই লেডিজ ড্রেসিং রুমের পিছন দিক হওয়া উচিত। কয়েক পা যেতেই, ডানদিকে একটা খোলা দরজা দেখতে পেল। ভিতরে তাকিয়ে দেখল, আলো জ্বলছে। মাঝখানে বড় টেবিল। টেবিল ঘিরে কিছু চেয়ার। টেবিলের ওপরে কিছু পত্র পত্রিকা ম্যাগাজিন। আর চারপাশেই বইয়ের র‍্যাক আর আলমারি। ভিতরে কারোকে দেখা যাচ্ছে না। নাকে পুরনো বইয়ের গন্ধ আসছে।

অরূপ আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল। আর একটা দরজা। দরজাটা বন্ধ। হিসাব মতো, এটা লেডিজ ড্রেসিং রুমের পিছনের দরজা। এদিকের বারান্দার আলো জোরালো নয়। লোকজনও কেউ নেই। টেনিস লনে একটাই আলো জ্বলছে। অরূপ লেডিজ ড্রেসিং রুমের পিছনের দরজাটা একটু হাত দিয়ে চাপল। ভিতর থেকে বন্ধ।

কিন্তু লেডিজ ড্রেসিং রুমের সব কিছু তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। কিছুই পাওয়া যায় নি। তাহলে, অতনু সেই টাকার বাণ্ডিল কোথায় রেখেছে ? যদি ধরে নেওয়া যায়, সে এই পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, তাহলে কোন্ দিকে যেতে পারে? অরূপ সামনে তাকাল। সেই মেহেদীর বেড়া লাগানো পিছন দিক।

ওদিকে কোথায় যাবে ? অন্তত টাকার বাণ্ডিল নিয়ে ওদিকে যাবার কোনো

মানে হয় না। খোলা জায়গা, কোনো ঘর নেই। পেছনের গেটম্যানের কাছে বাণ্ডিলটা দিয়েছে? অসম্ভব! নগদ টাকা, অতনু কারোকে বিশ্বাস করে দিতে পারে নি।

অরূপ পিছন ফিরল। যে পথে এসেছিল, সেদিকেই হাঁটল। লাইব্রেরির সামনে দাঁড়াল। আর তৎক্ষণাৎ ওর মস্তিষ্কে বিদ্যুতের ঝিলিক হানল। অতনু কী টাকার বাণ্ডিল নিয়ে লাইব্রেরিতে ঢুকেছিল? এ দরজা কী তখন খোলা ছিল? টাকা লুকিয়ে রাখবার মতো আদর্শ জায়গা। পুরনো বইয়ের ডাঁই। অনেক আলমারি আর র‍্যাক।

অরূপ ভিতরে ঢুকে পড়ল। কেউ নেই। টেবিলের সামনে গিয়ে, ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে, তীক্ষ্ণ চোখে চারদিক দেখল। মিলির কথা মনে পড়ল। কিছু ভালো বই আছে। বাকি সব রাবিশ। রাবিশ হলেও, তার সংখ্যা কম নয়। এক সময়ে সাহেবরা এই লাইব্রেরি করেছিল। বিরাট মোটা মোটা বই। বাঁধানো মলাট খসে পড়েছে। সোনার জলের লেখা ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। এখানেই কি কোথাও সেই বস্তু আছে? থাকলেও, এই বিশাল বইয়ের গাদা খুঁজে দেখা এখন সম্ভব নয়। সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। ও ম্যাগাজিন রেখে বাইরে বেরিয়ে এলো। ফিরে গেল বাঁদিকে ঘুরে, হলের সামনের দরজায়। ভিতরে ঢুকতেই, মিলি এগিয়ে এলো। ব্যস্ত অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় গেছলে তুমি?'

'বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম।' অরূপ বিব্রত নম্র স্বরে বলল।

মিলি বলল, 'বুঝেছি, তোমার এখানে তেমন ভালো লাগছে না। ভাবছিলাম তুমি না বলেই চলে গেলে নাকি?'

'আপনাকে না বলে যেতে পারি নাকি?' অরূপ হেসে বলল, 'ওখানে বাচ্চারা খেলছে। তাই বাইরে দাঁড়িয়ে টেনিস লন দেখছিলাম।'

মিলি হেসে উঠে বলল, 'তার মানে তোমার ভালো লাগছে না। আমিও এবার চলে যাব। মিউ বাড়িতে রয়েছে, আমাকে অনেকক্ষণ দেখতে পায়

নি। এসো, ওকে বলে আসি।'

অরূপ মিলির সঙ্গে হলের ভিতরে গেল। আসরের মহিলা পুরুষরা তখন বেশ মেতে উঠেছে। মিলি অতনুর কাছে গিয়ে বলল, 'শোন, আমি কোয়ার্টারে যাচ্ছি।'

অতনুর চোখ লাল। কিন্তু সে জিজ্ঞেস করল, 'সেই ছেলেটা কোথায়? কী যেন নাম?'

'অরূপ তো? এই তো আমার কাছে দাঁড়িয়ে।' মিলি বলল, 'অনেক খেয়েছ, আর খেও না। তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

অতনু অরূপকে দেখল। অরূপ বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

অতনু হাত তুলে বলল, 'গুড নাইট বয়, মিট ইউ এগেন। ও. কে. মিলি, তুমি যাও, আমি আসছি।'

মিলিকে অনেকেই আটকাবার চেষ্টা করল। সে মিষ্টি হেসে, সবাইকে নিরস্ত করে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসে অরূপকে বলল, 'বাব্বাঃ, আমার এ সব একদম পোষায় না। এক তো সপ্তাহে প্রত্যেক শনিবার রাত্রে বাঁধা ধরা আছেই। তোমার নিশ্চয় খুব খারাপ লাগছিল?'

'না—মানে, আমি তো এ সবে ঠিক অভ্যস্ত নই।' অরূপ মিলির সঙ্গে টেনিস লনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলল।

মিলি বলল, 'অভ্যস্ত কি আমিও ছিলাম? মুখার্জির পাল্লায় পড়ে এখন কিছুটা অভ্যস্ত হয়েছি। তাও পুরোপুরি পারি নে।'

'আপনি তো যেন পালাতে পারলে বাঁচছিলেন।' অরূপ হেসে বলল।

'সত্যিই তাই।' মিলি বলল, 'ও সব পেঁচি মাতলামি আর সাহেবিপনা আমার ভালো লাগে না। নেহাত একটা ছকে বাঁধা জীবন।'

দুজনেই অতনুর কোয়ার্টারর ব্লকের সামনে এসে দাঁড়ল। অরূপ বলল, 'দিদি, আমি এখন যাই।'

'হ্যাঁ, আজ আর তোমাকে আটকাব না। আবার কবে আসছ?'

'সময় পেলেই চলে আসব। তবে মিঃ মুখার্জি কিছু মনে করবেন না তো ?'
'ওর মনে করার কী আছে ? তোমাকে আমি বলছি, তোমার যখন ইচ্ছে চলে আসবে। আমার তো সারা দিনে কাজ বলতে কিছু নেই। ভাই বোনে গল্প করব। তবে, তোমাদের বাড়ির ঠিকানাটা বল তো। আমি একদিন যাব।'
অরূপ অস্বস্তি বোধ করল। মিলি বলল, 'ভয় নেই, আমি তোমার মা বোনদের সে-রকম কিছু বলব না। এমনি একদিন যাব, আলাপ করে আসব। আমারও তো ইচ্ছে করে, কোথাও গিয়ে একটু গল্প-গাছা করি।'
অরূপ ওদের বাড়ির ঠিকানা বলল। মিলি বলল, 'আমার ঠিক মনে থাকবে।'
অরূপ বিগলিত হয়ে বলল, 'দিদি, অনুমতি দিলে একটা প্রণাম করব।'
'না না, সে অনুমতি আমি দেব না।' মিলি ব্যস্ত হেসে বলল, 'প্রণাম আবার কী ? এই তো বেশ। তুমি আবার এসো।'
অরূপ বিদায় নিয়ে বাগানের ধারের রাস্তা দিয়ে এগোল। মিলি উঠে গেল সিঁড়ির বারান্দায়।

১১

অরূপ গেল ম্যানেজার মিঃ হাজরার বাংলোয়। বেল টিপতেই কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। নেপালী বয় এসে দরজা খুলে দিল। অরূপকে চিনতে পেরে, ভিতরে ঢুকতে দিয়ে বলল, 'সাহেব তাঁর ঘরে বসে আছেন।'

অরূপ চেনা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মিঃ হাজরা একটা বই পড়ছিলেন। অরূপকে দেখে ডেকে বসালেন, 'এসো, বসো।'

অরূপ ঘরে ঢুকে, মুখোমুখি চেয়ারে বসল। আজকের ঘটনা সব বলল। মিঃ হাজরা খুশি হয়ে বললেন, 'ওদের সঙ্গে বেশ ভাব জমেছে তাহলে? খুব ভালো। কিন্তু তোমার আসল কাজ কিছু এগিয়েছে কী?'

'এখনো তেমন কিছু নয়।' অরূপ বলল, 'আমি স্যার সব ভেবে দেখেছি। ক্লাবের চারপাশেই ঘুরেছি, আর বোঝাবার চেষ্টা করেছি, মুখার্জি লেডিজ ড্রেসিং রুম থেকে কোথায় যেতে পারেন, আর টাকাটা কোথায় রাখতে পারেন। আপনার একটা সাহায্য চাই।'

মিঃ হাজরা বললেন, 'কি সাহায্য চাই বল।'

'আমি একটু সময় নিয়ে লাইব্রেরি রুমটা দেখতে চাই। কিন্তু মুখার্জি টের পেলে হবে না। আর, এক দিনে এত আলমারি আর বইয়ের র‍্যাক ঘাঁটা সম্ভব নয়। মিনিমাম দু'দিন লাগবে।'

মিঃ হাজরা চিন্তিত মুখে বললেন, 'খুব কঠিন কাজ। মুখার্জি ক্লাব সেক্রেটারি! অবশ্য সে সব সময় ক্লাবে যায় না। রোজও যায় না। আর নিয়মানুযায়ী ক্লাব বেলা দশটাতেই খোলে। নিশ্চয় লাইব্রেরিও খোলে। কিন্তু ভেবে দেখতে হবে, কী ভাবে সেখানে তোমার যাবার ব্যবস্থা করা যায়। তোমার কি মনে হয়, লাইব্রেরিতে টাকা রাখতে পারে?'

'আমি সন্দেহ করছি মাত্র। লাইব্রেরি কি সার্চ হয়েছিল ?'

'সার্চ বলতে যা বোঝায়, সে-রকম কিছু হয় নি। লেডিজ ড্রেসিং রুমের সঙ্গে লাইব্রেরির কথাটা তেমন কেউ ভাবে নি।'

'আমি স্যার লাইব্রেরিটা একবার ঘেঁটে দেখতে চাই।'

মিঃ হাজরা এক মিনিট চিন্তা করলেন। তারপরে বললেন, 'আগামী সপ্তাহ থেকে মুখার্জি প্রায় রোজই কলকাতার হেড অফিসে যাবে।'

'তাই নাকি !' অরূপ চমকে উঠল, 'সর্বনাশ !'

'কেন, কিসের সর্বনাশ ?'

'উনি রোজ কলকাতায় যাওয়া মানে, টাকাটা যদি মিলের ভেতরই থেকে থাকে, রোজই কিছু টাকা কলকাতায় চলে যেতে পারে।'

'তার মানে, তুমি আগেই লাইব্রেরি দেখতে চাও ?'

'যদি উপায় থাকে।'

মিঃ হাজরা ড্রয়ার খুলে, একটা কার্ড অরূপকে দিলেন। বললেন, 'তুমি আগামী সোমবার বেলা বারোটা থেকে একটার মধ্যে আমাকে বাড়ির নাম্বারে টেলিফোন করবে। কিন্তু সোমবার দিনই মুখার্জি কলকাতায় যাবে। কাল পরশু তুমি লাইব্রেরিতে যাবার সুযোগ পাবে না। মুখার্জি দেখে ফেলতে পারে। তোমাকে ধরে নিতেই হবে, যদি সে টাকা সরায়, তবে একসঙ্গে হয়তো সব সরাবে না। আমি লক্ষ্য রাখবার চেষ্টা করব, সোমবার কলকাতা যাবার আগে সে লাইব্রেরিতে ঢোকে কি না।'

'তাহলে স্যার খুব ভালো হয়।' অরূপ কার্ডটা নিয়ে পকেটে রাখল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে আজ চলি স্যার।'

'হ্যাঁ, এসো।'

অরূপ বেরিয়ে এলো।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। অরূপ যখন সোমবার টেলিফোন

করল, মিঃ হাজরা বললেন, 'অতনুর কলকাতা যাওয়া এক সপ্তাহ পিছিয়ে গিয়েছে। তিনি নিজেই ব্যাঙ্কে টেলিফোন করে, সুযোগ মতো অরূপকে খবর দেবেন।

অরূপ কিছুটা নিরাশ হয়ে পড়ল। তার মধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটল। যাকে বলে উল্টো উৎপত্তি। মিলি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অরূপদের বাড়ি এসে হাজির। অরূপ তার একটু আগেই ব্যাঙ্ক থেকে ফিরেছে। দীপ্তিও তখন ছিল। অরূপ বিচলিত আর বিব্রত বোধ করলেও, মা বোন এবং দীপ্তির সঙ্গে মিলির পরিচয় করিয়ে দিল। মিলি অনায়াসেই সকলের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলল। মা পর্যন্ত মিলিকে পছন্দ করে ফেললেন। মাধুরি আর শান্তাও মিলির সহজ ব্যবহারে খুশি। কেবল দীপ্তিই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে রইল।

মিলি যাবার আগে, মাকে একটু ইশারায় জানিয়ে দিয়ে গেল, অরূপকে যেন ভুল বোঝা না হয়।

মিলিকে বিদায় দেবার পরে, অরূপ দীপ্তিকে মন্দিরপাড়ায় পৌঁছে দিতে গেল। খানিকটা গিয়েই দীপ্তি বলল, 'তোমাকে আসতে হবে না, আমি ঠিক চলে যেতে পারব।'

'আমি তোমাদের বাড়িই যাব।'

'দরকার কি ? তুমি মিলি মুখার্জির সঙ্গে গেলেই পারতে।'

'তার মানে ?'

'তার মানে খুবই পরিষ্কার। তুমি যে কেন মিলি মুখার্জিকে এত বিশ্বাস করেছ, তা বুঝতে পারলাম।'

'কি বুঝেছ ?'

'সেটা আর আমার মুখ থেকে না-ই বা শুনলে।'

শুরু হয়ে গেল আর একটা ভুল বোঝাবুঝি।

বৃহস্পতিবার বিকালে মিঃ হাজরার টেলিফোন এলো। তিনি অরূপকে বললেন, 'তুমি কাল সকাল দশটায় আমার বাংলোয় আসবে। ব্যবস্থা করেছি।'

এইটুকু বলেই লাইন কেটে দিলেন। অরূপ মনের অস্থিরতা দমন করার চেষ্টা করল। অফিসের ম্যানেজারকে বলে, একদিনের ছুটি নিল। সারা রাত্রি ঘুমোতে পারল না। পরের দিন সকালে দশটায় মিঃ হাজরার বাংলোতে হাজির হলো।

মিঃ হাজরা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি নিজে অরূপকে নিয়ে ক্লাবে গেলেন। বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'এ সাহেব লাইব্রেরিতে কিছু বইপত্র দেখবেন। সব ব্যবস্থা করে দিও।'

বেয়ারা তটস্থ হয়ে বলল, 'জী হুজুর।'

মিঃ হাজরা যাবার আগে অরূপকে বললেন, 'উইশ ইওর সাকসেস্। আই থিংক, নোবডি উইল কাম টু ডিস্টার্ব ইউ। বাট ইফ মুখার্জি কামস্ ইউ উইল হ্যাভ টু ফেস্ দ্যাট।'

অরূপ শান্ত ভাবে লাইব্রেরিতে ঢুকল। পিছনের দরজাটা খোলাই আছে। ও বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল, 'পেছনের এ দরজা কি খুলেই রাখা হয়?'

'জী হাঁ।'

তার মানে অতনু ব্যাংক থেকে ফিরে, লেডিজ ড্রেসিং রুম থেকে পিছনের দরজা দিয়ে লাইব্রেরিতে হয়তো ঢুকেছিল। ও বেয়ারাকে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি যাও। আমি বই দেখছি।'

বেয়ারা চলে গেল। অরূপ প্রথমেই লক্ষ্য করল, বড় বড় কাঁচের আলমারি-গুলো। সৌভাগ্যবশত আলমারিগুলোর পাল্লায় তালা লাগানো নেই।' চাবিও বন্ধ করা নেই। ও প্রথমে আলমারিগুলোর মোটা মোটা বই টেনে সরিয়ে দেখতে লাগল। অতনু টাকা এখানে রাখলে, আলমারির মধ্যেই রাখা স্বাভাবিক।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সবগুলো আলমারির বই ঘাঁটা হয়ে গেল। অরূপের দু' হাত আর নাক মুখ ধুলোয় ভরে গেল। ঘেমে ভিজে উঠল। প্রায় প্রত্যেকটি বই সরিয়ে ও দেখেছে। কোথাও লাখ টাকার বাণ্ডিল নেই। আলমারির ভিতরে না থাকার অর্থ, লাইব্রেরিতে রাখে নি। খোলা আয়রন র‍্যাকে বইয়ের পাঁজায় নিশ্চয় টাকার বাণ্ডিল রাখে নি। অরূপ হতাশ হয়ে পড়ল।

পাখার নিচে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ভাবল। তারপরে বইয়ের র‍্যাকগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। কিন্তু দেখে কোনো লাভ নেই। দেয়ালের গায়ে র‍্যাকের ওপর বইগুলো সরিয়ে দেখতে আরম্ভ করল। শেষ একটা চেষ্টা দেখতে দেখতে. একটা লম্বা র‍্যাকের কোণে গিয়ে, বিরাট মোটা রয়্যাল সাইজের একটা বই ধরে টান দিল। বইটা নড়ল না। কেন? ভালো করে দেখল, বইটা সুতো দিয়ে র‍্যাকের গায়ে বাঁধা। সুতোর বাঁধনটা কোথায় দেখতে গিয়ে বইয়ের মলাটটা একটু আলগা হয়ে গেল। আর বইয়ের পাতার বদলে, পাতলা পলিথিনে মোড়া অতি পরিচিত নোটের বাণ্ডিল!

অরূপের বুকের মধ্যে ধক ধক করে উঠল। ভিতরে হাত ঢোকাতে গিয়ে থমকে গেল। না, আর হাত দেওয়া উচিত হবে না। ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ওর সমস্ত প্রাণটা এসে যেন গলার কাছে ঠেকে গিয়েছে। একটা চিৎকার ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। নিজেই নিজের গলা টিপে ধরে ফিসফিস করে বলল, 'আমার ভবিষ্যৎ, আমার মানসম্মান, আমার মা বোন ভাইয়ের বিরাগ বিতৃষ্ণা, সব এখানে! ওহ্, বিশ্বাস করতে পারছিনে। কিন্তু ফিরে চল অরূপ, ফিরে চল। হাত দিও না। এ সাপের থেকেও মারাত্মক। এখনো বিষের ছোবল আছে এই টাকার গায়ে।'...

অরূপ দ্রুত হাতে বইটার মলাট আস্তে চেপে দিল। দিয়ে সরে এলো। চারদিকে তাকাল। সব ঠিক আছে। কোথাও কোনো বিশৃখলা নেই।

ঘাঁটাঘাটি করার চিহ্ন নেই। ট্রাউজারের পকেট থেকে রুমাল বের করে, মুখ মুছল। হাতের ধুলো মুছল। বেরিয়ে গেল বাইরের হলে।

বেয়ারা এগিয়ে এসে বলল, 'হো গয়া সাব ?'

'নহি। ফির আয়েঙ্গে।' অরূপ বলল, 'আভি হম ম্যানেজার সাবকো কোঠিমে যা রহে।'

'বহুত আচ্ছা সাব।'

বলে সেলাম ঠুকল বেয়ারা।

অরূপ হাতের ঘড়ি দেখল। সাড়ে এগারোটা। মিঃ হাজরার এগারোটার পর বাংলোয় ফেরার কথা। দ্রুত সেখানে গেল। মিঃ হাজরা তখনই মাত্র বাংলোয় ঢুকেছেন। অরূপ হাঁফাচ্ছিল।

মিঃ হাজরা জিজ্ঞেস করলেন, 'খোঁজ পেলে ?'

'পেয়েছি স্যার।'

'পেয়েছ!' মিঃ হাজরা চিৎকার করে উঠলেন।

অরূপ ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, 'আস্তে স্যার, টাকা আছে পালিথিনে মোড়া। আমি টাকায় হাত দিই নি। কেননা এখন পুলিশ সন্দেহ করতে পারে, আমি টাকাটা ওখানে রেখে মিঃ মুখার্জির ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছি। কেননা, আমি যে লাইব্রেরিতে গেছি, বেয়ারা সেটা দেখেছে। টাকার গায়ে নিশ্চয়ই মুখার্জির আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে। তাতেই প্রমাণ হবে, টাকাটা তিনি রেখেছেন।'

'গুড, ভেরি গুড আইডিয়া।' মিঃ হাজরা রীতিমত উত্তেজিত। ঘরে ঢুকে বললেন, 'এখন কী করা উচিত তুমি মনে কর ?'

'আপনি আগে আমার ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে ফোন করুন। ওঁকে বলুন সব কথা, কিন্তু ব্রাঞ্চ অফিসে কোনো কথা না জানিয়ে তিনি যেন হেড অফিসকে সব জানান। হেড অফিসকে বলতে বলবেন, পুলিশকে খবর দিতে। পুলিশ যেন অবশ্যই ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টকে সঙ্গে নিয়ে

এখুনি আসে।'

'বেশ। তাই বলছি। তুমি ওই লম্বা সোফাটায় শুয়ে পড়।' মিঃ হাজরা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলেন।

ব্যাংকের চারজন অফিসার আর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার, সঙ্গে ফটোগ্রাফার আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টকে নিয়ে যখন এলেন, তখন বেলা দুটো। ইতিমধ্যে মিঃ হাজরার সঙ্গে অরূপের কথা হয়ে গিয়েছিল। তিনি সবাইকে তাঁর ঘরে বসিয়ে, মেইন অফিসের বড়বাবুকে টেলিফোন করে বললেন, 'মিঃ মুখার্জিকে জরুরি দরকার। তাকে সঙ্গে নিয়ে আপনি আমার বাংলোয় চলে আসুন।'

দশ মিনিটের মধ্যেই অতনু মুখার্জিকে নিয়ে এক ভদ্রলোক বাংলোয় এলেন। মুখার্জি সবাইকে দেখেই চমকে উঠল। মুখ পাংশু বর্ণ। অরূপের দিকে একবার দেখেই, সে ঘামতে আরম্ভ করল। মিঃ হাজরা বললেন, 'বসুন মিঃ মুখার্জি।'

মুখার্জি বসতে পারল না। স্খলিত গলায় বলল, 'কী হয়েছে স্যার?'

গোয়েন্দা অফিসার বললেন, 'অনুমান করতে পারছেন, 'কী হয়েছে?'

অতনু কথা না বলে, ঘাড় নাড়ল। ব্যাংকের হেড অফিসের একজন অফিসার বললেন, 'মিঃ মুখার্জি, বাংলায় একটা কথা আছে, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। আপনাকে সেই রাত্রে অনেক করে বলেছিলাম, টাকাটা নিয়ে থাকলে দিয়ে দিন। দিলেন না। আপনার জন্য একটা ছেলের জীবন নষ্ট হতে চলেছিল। কিন্তু সে নিজেই নিজেকে বাঁচিয়েছে। এবার বলবেন কি, টাকাটা কোথায় রেখেছেন?'

অতনুর গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। মুখ লাল। বলতে গিয়ে শুকনো গলায় স্বর কেঁপে গেল, বলল 'আমি তো টাকা—।'

'শাট আপ!' গোয়েন্দা বললেন, 'মিঃ হাজরা, এর সঙ্গে কথা বলে লাভ

নেই। আগে এর হাতের ছাপ নিয়ে নেওয়া হোক। তারপর আমরা আসল জায়গায় যাব।'

তৎক্ষণাৎ ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট এগিয়ে এলেন। তিনি তৈরিই ছিলেন। অতনুর দুই হাতে বেগুনি রঙের তরল পদার্থ দিলেন। তারপর একটা বড় কাঁচে ছাপ তুলে নিয়ে বললেন 'যান, হাত ধুয়ে আসুন।'

কিন্তু অতনু তখন ভেঙে পড়ার মুখে। সে অরূপের দিকে তাকাল। অরূপ মুখটা ফিরিয়ে নিল। কারণ, ওর চোখের সামনে মিলির মুখটা ভাসছে।

গোয়েন্দা অফিসার বললেন, 'চলুন এবার আমরা ক্লাবের লাইব্রেরিতে যাই।'

'লাইব্রেরি!' অতনু প্রায় চিৎকার করে উঠল। তারপরেই একটা চেয়ারে বসে দু' হাতে মুখ ঢাকল।

মিঃ হাজরা বললেন, 'কিছু বলবেন, মুখার্জি?'

অতনু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, 'স্যার আমি—আমি টাকাটা সরিয়েছি।' বলেই টেবিলের ওপর মাথা নুইয়ে দিল।

সংবাদ-পত্রে খবরটার হেডিং ছিল—'খোয়া যাওয়া টাকা উদ্ধার।'

অরূপ দীপ্তিকে নিয়ে টালিগঞ্জে মিলির পিত্রালয়ে উপস্থিত হলো। অতনুর চাকরিটা গিয়েছে। ব্যাংক কোনো কেস করে নি তার বিরুদ্ধে। সেটা অরূপের অনুরোধেই। দীপ্তিকে নিয়ে অরূপ যখন মিলিদের বাড়ি এলো, মিলি তখন শুয়ে ছিল। উঠে এলো শূন্য চোখে। চোখের কোল বসা দু' দিনেই চেহারা শীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

অরূপ ডাকল, 'দিদি।'

মিলি শূন্য চোখে তাকাল। অরূপ বলল, 'দিদি, আমার ওপর রাগ করবেন না। আমি বড় অসহায় হয়ে—'

মিলি হঠাৎ কেঁদে উঠে, অরূপের দু' হাত টেনে নিল, 'না, না, তোমার

ওপর রাগ করব না ভাই তোমাকে আশীর্বাদ করব। পাপের শাস্তি পেতেই হবে। তবে তোমাকে আমি আজ থেকে নতুন চোখে দেখব। তুমি নিজেই কেবল উদ্ধার পাও নি, আমাদেরও উদ্ধার করেছ। আমার স্বামীও উদ্ধার পেল, তবে মস্ত বড় একটা শিক্ষা পেয়ে। এর দরকার ছিল।'

দীপ্তি কাঁদছিল। মিলি তাকেও বুকের কাছে টেনে নিল। বলল, 'আমার কাছ থেকে এটুকু শিখে নাও ভাই, জীবনে সব কিছুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নত হয়ো না। আমি আমার স্বামীকে নিয়ে নতুন করে জীবন গড়ে তুলব।

দীপ্তি মিলির পায়ে নত হয়ে পড়ল।

—

সহযাত্রী

মেল ট্রেনটার প্রথম শ্রেণীর দরজার পাশেই. রিজারভেশনের নামের লিস্ট টাঙানো ছিল। দূর পাল্লার মেল ট্রেন। আজকাল দূর পাল্লার অনেক এক্সপ্রেস্ বা মেল ট্রেন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, এবং খুব কম স্টপেজ দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছোয়। আমি যে মেল ট্রেনের যাত্রী, এটাকে সাবেকি বললেই হয়। যদিও মেলটির রাজকীয়তা তার জন্য কিছুমাত্র কমে নি। এ মেল গাড়িটির সমস্তটা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত না হলেও, একটি বগী শীততাপ নিয়ন্ত্রিত।

'শীততাপ নিয়ন্ত্রিত'—এরকম শুদ্ধ বাংলা কোনো যাত্রীই বলে না। বলে এয়ার কনডিশনড। আমি যে এয়ার কনডিশনড কামরার টিকেট কাটতে পারতাম না, এমন না। কারণ টাকাটা আমাকে খরচ করতে হতো না। আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে, আমি সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে, একটি সেমিনারে যোগ দিতে যাচ্ছি। আহ্বায়ক উদ্যোক্তারা, সরাসরি ট্রাঙ্ককল করেই জানতে চেয়েছিলেন, আমি কী ভাবে যেতে চাই। তাঁরা আমাকে প্লেনে যাবার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। আমি তা নাকচ করেছিলাম। কাজের ব্যস্ততার দিক থেকে দেখতে গেলে, আমার প্লেনে যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু একটা বড় রকমের কাজ শেষ করে, আমি একটু আরামের নিশ্বাস ফেলতে চাইছিলাম। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে রিলাকস করতে চাইছিলাম। সে জন্যই আমি ট্রেনে যাবার সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম। সময়টা যে-হেতু জানুআরি মাস, শীতকাল, সেই হেতু আমি এয়ার কনডিশনড কামরায় যাওয়াও বাতিল করে দিয়েছিলাম।

এই সিদ্ধান্ত নেবার সময়, আমি আর এক দিকের বাস্তবতা ভেবে দেখি নি। সে-ভাবনাটা মাথায় এলো, হাওড়া স্টেশনে এসে। ট্রেনে যাওয়া মানেই অনিবার্য ভাবে অন্য যাত্রীর সঙ্গী হওয়া। দুই আসনের সিঙ্গল কুপে জায়গা

পেলেও, অন্ততঃ একজন যাত্রী আমার সঙ্গী হবেই। সঙ্গী যাত্রী থাকলেই যে অসুবিধা ঘটবে, তা ভাবার কোনো কারণ নেই। কেবল একটিই মাত্র আশঙ্কা। সঙ্গী যাত্রীটি কেমন হবে। কেন না, তারই ওপর অনেকটা নির্ভর করবে আমার নির্বিঘ্ন ও শান্তিদায়ক ভ্রমণ।

স্টেশনে এসে এ পর্যন্ত ভাবার পরে, যখন প্রথম শ্রেণীর দরজার পাশে ঝোলানো নামের লিস্টের দিকে তাকালাম, তখন আমার মনটা বেশ একটু দমে গেল। দেখলাম, আমার নাম রয়েছে একটি চার ব্যর্থ-এর কুপে-তে। আমি ছাড়া আরও তিন জনের নাম রয়েছে সে কুপে-তে। মিস্টার ও মিসেস আর গুপ্ত, এবং মিস এ দত্ত। তার মানে একটি পরিবার। সম্ভবতঃ স্বামী স্ত্রী ও কোনো আত্মীয়া। গুপ্ত ও দত্ত বাঙালী অবাঙালী, দুই-ই হতে পারে। বাঙালী অবাঙালী বা তাঁদের বয়স যা-ই হোক, তা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার কিছু নেই। দীর্ঘ দু রাত্রির ভ্রমণ নির্বিঘ্নে আর শান্তিতে কাটলেই হলো। এর মধ্যে একটিই আমার কাছে শুভ বলে মনে হলো। আমাকে দেওয়া হয়েছে একটি লোয়ার বার্থ। তবে আমার সহযাত্রীর ওপর অবিচার করা হয়েছে বলেই আমার মনে হলো। গুপ্ত দম্পতীকেই লোয়ার বার্থ দুটো দেওয়া উচিত ছিল। অবিশ্যি সেটা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারবো। সবই নির্ভর করছে আমাদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় ও সম্পর্কের ওপর।

মেল ট্রেনটা ছাড়ে প্রায় রাত্রি দশটার কাছাকাছি সময়ে। তখনও পনরো কুড়ি মিনিট সময় ছিল। আমার মালপত্রের মধ্যে ছিল একটি মাঝারি আকারের স্যুটকেস্, একটি ব্রিফকেস্। গাড়ি নিয়েই স্টেশনের পার্কিং-এ ঢুকেছিলাম। স্যুটকেস্ আর ব্রিফকেস্ নেবার আগে নিজের বগী ও আসনটির সন্ধান করে নিয়েছিলাম। তারপর গাড়ির কাছে ফিরে গিয়ে ড্রাইভারকে স্যুটকেস্ নামিয়ে দিতে বললাম। স্যুটকেস্ আর ব্রিফকেস্ আমার সামনের আসনেই রাখা ছিল। ড্রাইভারকে বললাম, 'তোমাকে আর আসতে হবে না। এইটা আমিই হাতে করে নিয়ে যেতে পারবো।

ড্রাইভার তবুও আপত্তি করলো। আমি তার আপত্তি শুনলাম না। বললাম, 'আমার এর জন্য কষ্ট হবে না। আমার কম্পার্টমেন্ট সামনেই। তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও।'

আমি এক হাতে স্যুটকেস্, অন্য হাতে ব্রিফকেস্ নিয়ে, আমার কামরায় গিয়ে উঠলাম। অন্যান্য যাত্রীরাও তখন উঠতে ব্যস্ত। মালপত্র নিয়ে কুলি-দের ভিড়ও কম নেই। ইংরেজি অক্ষর মিলিয়ে আমার কুপে খুঁজতে গিয়ে দেখলাম, সেটা কামরার একেবারে অন্য প্রান্তে। দরজাটা বন্ধ দেখে, বাঁ হাতের স্যুটকেস্ নামিয়ে, হাতল টেনে খোলবার চেষ্টা করলাম। খুললো না।

তার মানে, আমার সহযাত্রীরা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। আমি দরজায় আস্তে করে ঠক্ ঠক্ শব্দ করলাম। প্রায় দশ সেকেণ্ড বাদে দরজা খুললো। আমি তখন প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম। দেখলাম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে দোহারা চেহারার একটি লোক। বয়স অনুমান চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। পরনে তার লুঙ্গি আর গায়ে বোতাম খোলা পাঞ্জাবী। বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। ইনিই নিশ্চয় মিঃ আর গুপ্ত হবেন। আমাদের পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হলো। লোকটির রঙ ফর্সা। চওড়া মুখ। মোটা নাক। এক জোড়া সরু গোঁফ। চোখ দুটো বড়, আর ঈষৎ লাল। দরজাটা খুলে দিয়ে, আমাকে একবার দেখে, সরে দাঁড়ালেন। আমি স্যুটকেস্ তুলে নিয়ে ভিতরে ঢুকলাম।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা থাকলেও, কুপের মধ্যে বেশ গরম। সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে কসমেটিক আর বিশেষ কো[illegible] বিদেশী এসেন্সের গন্ধ ছড়িয়েছিল। তার সঙ্গে আরও একটি গন্ধ আমার ঘ্রাণে ধরা পড়ছিল। সুরার অনুগ্র গন্ধ। কিন্তু কোন্ আসনটির দিকে এগিয়ে যাবো, স্থির করতে আমার একটু সময় লাগলো। লোয়ার বার্থ-এর একটিতে সালোয়ার কামিজ পরা এক মহিলা লম্বা হয়ে শুয়েছিলেন। মলাট ঢাকা দেওয়া একটা বই পড়-

ছিলেন তিনি। মহিলা বলতে, তাঁর বয়স, আমার চোখে চব্বিশ পঁচিশের বেশি না। আমি ঢোকার পরে, সে একবার চোখের সামনে থেকে বইটা সরিয়ে আমাকে দেখলো। আবার বইটা চোখের ওপর টেনে নিল। আর একটি লোয়ার বার্থেও আর এক মহিলা, যিনি বসেছিলেন কাঁচ বন্ধ জানালা ঘেঁষে। তাঁর বয়সও তিরিশের কম নিশ্চয়ই। পরনে তাঁর কাঁচুলি কাট নীল জামা, নীল শাড়ি। তিনি একটি ইংরেজি রঙীন ফিলম্ পত্রিকা নিয়ে, আসনের ওপর দু পা ছড়িয়ে বসেছিলেন। হয় তো উনিই হবেন মিসেস গুপ্ত। কারণ, চকিতের জন্য হলেও, তাঁর ঢেউ খেলানো খোলা চুলের সিঁথিতে সরু লাল রেখাটি চোখে পড়েছিল। অন্য যে-জন শুয়ে বই পড়ছিলেন, আমি তাঁর মুখ ও মাথা পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছিলাম না। হয় তো সে মিঃ গুপ্তের কোনো বোন। আমি যে-রকম এদের ভেবেছিলাম, এঁরা তা নন, সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল। কারণ দুই মহিলার বয়সই প্রায় সমান। দুজনেই যুবতী।

মহিলাদের কারোকে ভালো করে দেখবার আগে, আমি আমার বসবার জায়গাটি ঠিক করে নিতে চাইলাম। কিন্তু সালোয়ার কামিজ পরা যুবতীটির আচরণ আমার মোটেই ভালো লাগলো না। সে যে-ভাবে মুখের সামনে থেকে বই সরিয়ে, একবার আমাকে দেখেই, আবার বই টেনে মুখ আড়াল করলো, এটা মোটেই ভদ্রজনোচিত আচরণ হলো না। ভদ্রলোক তখনও দাঁড়িয়েছিলেন। জানালার কাছে বসা যুবতী ভদ্রলোকের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। ভদ্রলোকও তার দিকে একবার দেখলেন। একটু মাথা ঝাঁকিয়ে, হাত তুলে বসে থাকবার সংকেত করলেন। তারপরে সালোয়ার কামিজের দিকে তাকিয়ে, মোটা স্বরে ডেকে বাংলায় বললেন, 'অলকা' তুমি উঠে বস। ভদ্রলোককে বসতে দাও।'

আমি তখন হাত থেকে স্যুটকেস্‌টা নামিয়ে রেখেছি। ব্রিফকেস্‌টা হাতে। সালোয়ার কামিজ পরা যুবতী মুখের সামনে থেকে বইটা আবার সরালো।

চোখ দুটো তার বেশ বড়ই, এবং কালো। রঙ প্রায় ফরসা। মুখের গড়ন প্রায় গোল। আই লাইনার ছাড়াও কাজলের টান আছে চোখে। নাক তেমন চোখা না। পুষ্ট ঠোঁটে রঙের প্রলেপ। তার দু চোখে যেন চাপা বিরক্তি ফুটে উঠলো। আমাকে দেখে, তাকালো ভদ্রলোকের দিকে। তার-পরে মাথা তুলে, জানালা ঘেঁষে সরে বসলো।

তখনও পর্যন্ত শোবার গদী টেনে নামানো হয় নি। আমি ব্রিফকেস্‌টা আপাততঃ ওপরের বার্থে রাখলাম। সিটের ওপর স্যুটকেস্‌টা রেখে, গায়ে জড়ানো শালের ভিতরে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে বের করলাম স্যুটকেসের চাবি। মনে মনে সহযাত্রীদের কথা ভাবছি, আর মনটা ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি যে এদের কাছে অনাহূত, তা বুঝতেই পারছি। কিন্তু আমি নিরুপায়। এ কুপে-তে আমি ইচ্ছে করে আসি নি। আমার টিকেটের ভাগ্য আমাকে এখানে ঢুকিয়েছে। অন্যথায় এদের সহযাত্রী হবার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই।

স্যুটকেস্ থেকে বের করলাম রাত্রে পরে শোবার মোটা ছাপা কাপড়ের পাজামা আর পুরো হাতা জামা। গায়ে জড়াবার জন্য একটা মোটা শুজনি, আর ফুঁ দিয়ে ফোলানো বেলুন বালিশটাও বের করলাম। ব্রিফকেসের ওপর বেলুন বালিশটা রেখে ভালোই শোয়া যাবে। দাঁত মাজা, দাড়ি কামানো ইত্যাদি প্রয়োজনীয় যা কিছু সবই আছে ব্রিফকেসের মধ্যে। প্লাস্টিকের একটি গ্লাসও আছে। নেই শুধু জলের পাত্র। জানতাম, এ গাড়িতে ডাইনিং কার আছে। তেষ্টা পেলে সেখানে গিয়ে জল খেতে হবে। অথবা, হয়তো পয়সা দিলে, এক বোতল জল দিয়েও যেতে পারে। সহ-যাত্রীদের একটি বেশ বড় আকারের, নীল রঙের ওপর নানা রকম এনা-মেলের কারুকার্য করা জলের জাগ রয়েছে। ডান দিকের লোয়ার বার্থে, বেশ কয়েকটি ছোট খাটো ব্যাগ রয়েছে। ভদ্রলোক ইতিমধ্যে বসেছেন। ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে আছেন একটি ব্যাগ। সিগারেটের শেষাংশটি

গাড়ির মেঝেতে ফেলে পায়ের স্যাণ্ডেল দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ তাঁর হাতের কাছেই রয়েছে ছাইদানি।

আমি স্যুটকেস্‌টা বন্ধ করে, রাত্রে পরার জামা পাজামা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। গায়ের শালটাও খুলে রাখলাম। গাড়ি ছাড়তে এখনও কয়েক মিনিট বাকি। শেষ মুহূর্তের যাত্রীরা হুড়মুড় করে উঠছে। যাত্রীদের বিদায় জানাতে আসা, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের ভিড়ও কম ছিল না কামরার মধ্যে। আমি একবার আমার সহযাত্রীদের দিকে তাকালাম। তৎক্ষণাৎ বুঝলাম, তাদের সকলের দৃষ্টিই ছিল আমার দিকে। আমি চোখ তুলে তাকাতেই সকলের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরে গেল। আমি জামা কাপড় বদলাবার জন্য, বাথরুমের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলাম। যাবার আগে, দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলাম। মিনিট দুয়েক লাগলো জামা কাপড় বদলাতে। আবার ফিরে এলাম কুপে-তে। এবার ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল না। ঢুকতেই চোখে পড়লো, ভদ্রলোক রঙীন পানীয়র গেলাসে চুমুক দিচ্ছেন। আমি হঠাৎ দরজা খুলে ঢুকতেই, একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে, গেলাসটা ডান দিকের মুখ খোলা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মনে মনে হাসলাম। দরজাটা বন্ধ করে, কোঁচানো ধুতি পাঞ্জাবী স্টিলের র‍্যাকে ঝুলিয়ে রাখলাম। পশমী শালটাও ভাঁজ করে সেখানেই রাখলাম। পাঞ্জাবীর পকেটে রয়েছে আমার পার্স, সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই। পার্সের মধ্যে আছে কিছু টাকা, ট্রেনের টিকিট আর রিজারভেশনের আলাদা কার্ড। স্যুটকেস্‌টা ঢুকিয়ে দিলাম সিটের নিচে। ঝুলিয়ে রাখা পাঞ্জাবীর পকেট থেকে বের করে নিলাম পার্স, সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই। ওপরের বার্থ থেকে ব্রিফকেসটা নামিয়ে খুললাম। পার্সটা ঢুকিয়ে দিলাম ভিতরে। মার্কুইসের, সমাজতত্ত্বের ওপর একটা বই বের করে নিলাম। এখন আমি অনেকটা

ঝাড়া হাত পা। গাড়িও ছাড়লো। আমি প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট ধরালাম। ভাবলাম, ভদ্রলোককে বলি, উনি অনায়াসেই আমার সামনে মদ্য পান করতে পারেন। আমার কোনো আপত্তি তো নেই বটেই, ও বিষয়ে আমার কোনো নীতিবাগীশতা বা নিষেধও নেই।

'আপনি কি এখনই শোবেন?' ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

আমি ওঁর দিকে তাকালাম। কথাটা উনি আমাকেই জিজ্ঞেস করেছেন। বললাম, 'না। অন্তত ঘণ্টা খানেকের মধ্যে নয়।'

'তা হলে ওকে সিটটা ছেড়ে আসতে বলতাম।' ভদ্রলোক একটু হেসে, সালোয়ার কামিজ পরা যুবতীকে চোখের ইশারায় দেখিয়ে বললেন, 'আপনাকে নিচের বার্থই দেওয়া হয়েছে।'

আমি সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, 'আপনাদের অসুবিধে হলে আমি ওপরের বার্থে গিয়ে শুতে পারি। আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'দেখলে?' ভদ্রলোক এদিকে ওদিকে ঘাড় ফিরিয়ে দুই যুবতীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'আমি বলেছিলুম, ভদ্রলোককে দেখেই মনে হচ্ছে, রাত্রে নিচের বার্থ ছেড়ে দিতে উনি আপত্তি করবেন না।' তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'আপনি আসার আগে, আপনাকে নিয়ে আমরা অনেক রকম আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলুম। আপনি বুড়ো মানুষ হলে কিছুই বলার ছিল না। আর আপনি যখন জামাকাপড় বদলাতে গেলেন, তখনই আমি এদের বলেছিলুম, আপনি নিচের বার্থ ছেড়ে দিতে আপত্তি করবেন না। আমার কথাই ঠিক হলো। আমরা বলবার আগেই আপনি নিজে থেকেই রাজি হয়ে গেলেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

আমি হেসে বললাম, 'এতে ধন্যবাদ দেবার কী আছে? চার বার্থের কুপেতে আপনি দুজন মহিলা নিয়ে যাচ্ছেন। নিচের বার্থ দুটো রাত্রে আপনারই বেশি দরকার।'

'অথচ রিজারভেশনের লোকটি সে কথা বুঝলো না।' ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'বোধহয় আপনার টিকেটটা আগে কাটা হয়েছিল।'

সালোয়ার কামিজ পরা যুবতী রুষ্ট স্বরে বললো, 'আমি তো বলেইছিলুম, কিপটেমি না করে চারটে বার্থই রিজার্ভ করে নেওয়া ভালো। তা হলে আর উট্‌কো ঝামেলা পোয়াতে হতো না।'

কথাগুলো আমার কানে খুব খারাপ ভাবে বাজলো। উটকো ঝামেলা বলতে সে নিশ্চয় আমাকেই বোঝাতে চাইছে। ভদ্রলোক হঠাৎ গম্ভীর মুখে, রীতিমতো চাপা ঝাঁজের স্বরে বললেন, আজে বাজে কথা বলছ কেন ? মানি, গোটা কুপেটা রিজার্ভ করতে পারলে আমাদের সুবিধে হতো। তা তো পাই নি। এখন ভদ্রলোকের সামনে এভাবে কথা বলার মানে কী ?'

'সত্যি অলকা, তুই এখনো কোথায় কী বলতে হয়, তা শিখিস নি।' ইংরেজি ফিলমের রঙীন পত্রিকা হাতে যুবতী হেসে কথাগুলো বললেও, তার বিরক্তি চাপা থাকলো না। এবং সে সলজ্জ কুণ্ঠিত হেসে আমার দিকে তাকালো। বললো, 'আপনি কিছু মনে করবেন না।'

আমি বললাম, 'আপনাদের অসুবিধে আর অস্বস্তির ব্যাপারটা আমি বুঝি। আমিও যদি আপনাদের মতো সপরিবারে যেতাম, তা হলে একজন বাইরের লোক থাকলে একই রকম অস্বস্তি বোধ করতাম। বিশেষ করে মহিলারা থাকলে নানান অসুবিধেয় পড়তে হয়। তবে আপনাদের আমি বলেও রাখছি : দিনের বেলা আপনাদের কোনোরকম অসুবিধে হলে, আমাকে বলবেন। আমি সেই সময়টা কুপের বাইরে চলে যাবো।'

'অসুবিধে আর কী হতে পারে ?' ভদ্রলোক বললেন, 'জামাকাপড় বদলাবার জন্য দুচার মিনিট লাগতে পারে। সেরকম হলে, বাথরুমেই যাবে।'

আমি 'বললাম, 'না, তার কী দরকার ? মোটের ওপর আমাকে নিয়ে আপনারা ভাববেন না।'

'আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।' অলকা হঠাৎ সোজা হয়ে বসে, হাতের বই-সুদ্ধ আমার দিকে দুহাত জোড় করে বাড়িয়ে ধরলো। হেসে বললো, 'অমনটি বলা আমার ঠিক হয় নি। আমি একটু মাথা মোটা আছি।'
অলকার কথা শুনে, ভদ্রলোকের সঙ্গে অন্য যুবতীটিও খিলখিল করে হেসে উঠলো। অলকার হঠাৎ ওরকম আচরণ দেখে আর কথা শুনে, আমিও না হেসে পারলাম না। তার সরল স্বীকারোক্তিটা বোধহয় একেবারে মিথ্যে না। ভদ্রলোক হাসতে হাসতেই বললেন, 'তোমার যে মাথা মোটা, সেটা তা হলে বোঝ।'
'দেখছিস মহুয়া, আমার পেছনে লাগছে?' অলকা অন্য যুবতীটির দিকে তাকিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বললো।
মহুয়া নাম্নী যুবতী ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি আবার ফোড়ন কাটছ কেন? ওর যা মনে হয়েছে, তাই বলেছে।'
ভদ্রলোক হাত জোড় করে, অলকা আর মহুয়া, দুজনের দিকেই নাড়িয়ে বললো, 'আমি আর কিছু বলছি নে বাবা।'
আমি ইতিমধ্যে মহুয়াকেও দেখে নিয়েছিলাম। ওকে ফরসাই বলতে হবে। ছিপছিপে, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী। টিকলো নাক, টানা চোখ। তার ঠোঁটেও রঙের প্রলেপ, এবং চোখে আই লাইনার ছাড়াও কাজলের রেখা টানা। অলকার তুলনায়, তাকে হয় তো রূপসী বলা যায়। কিন্তু অলকার শরীরের ঔদ্ধত্যের মধ্যে একটা অন্য আকর্ষণ আছে। দুজনেরই দু হাতের দশ আঙুল ম্যানিকিওর করা। মহুয়ার মতোই অলকারও ঘাড় অবধি ছাঁটা চুল খোলা। কিন্তু তাদের দুজনের মধ্যে 'তুই' সম্বোধন শুনে সম্পর্কটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে ভদ্রলোক যে মিঃ গুপ্ত, সে-বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।
মিঃ গুপ্ত ব্যাগের ভিতর থেকে তাঁর পানীয়র গেলাস তুলে চুমুক দিলেন। ও বিষয়ে যে আমি আপত্তি করবো না, তা উনি বুঝে নিয়েছেন। গেলাসে

চুমুক দিয়ে, তিনি মহুয়ার দিকে তাকালেন। মহুয়াও ওঁর দিকে তাকালো। মহুয়ার ঠোঁটের কোণে হাসি। চোখের তারায় যেন কিসের ইশারা। আমি লক্ষ্য না করার ভান করে, বইটা টেনে নিলাম। আর বইটা নিতে গিয়েই, চকিতে চোখে পড়লো, অলকা মিঃ গুপ্তর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে।

'স্যার, আপনার কি একটু হুইস্কি চলবে?'

মিঃ গুপ্ত যে আমাকেই কথাটা জিজ্ঞেস করেছেন, তা বুঝতে অসুবিধে হলো না। আমি মুখ তুলে হেসে বললাম, 'না। আপনি চালিয়ে যান।'

'আমি একলা চালাচ্ছি নে।' মিঃ গুপ্ত বললেন, 'আমরা তিন জনেই চালাচ্ছি। তাই বলছিলাম, আপনি আর বাদ থাকেন কেন? সকলে মিলে তা হলে একটু আসর জমানো যেতো।'

বললাম, 'আমার জন্য ভাববেন না। আপনারা খান। আপনাদের আসর জমে উঠুক।'

দেখলাম মহুয়া ব্যাগের আড়াল থেকে পানীয়র গেলাস হাতে তুলে নিল। অলকা বাঁদিকে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে, আসনের নিচের থেকে ওর গেলাস বের করে আনলো। তিনজনেরই দৃষ্টি আমার দিকে। তিনজনেরই মুখে হাসি। মিঃ গুপ্ত বললেন, 'আমরা গাড়িতে উঠেই শুরু করেছিলাম। আপনি আসাতে আড়াল করতে হয়েছিল। কী ভাবে নেবেন না নেবেন, জানতুম না তো। সকলেই সব কিছু পছন্দ করে না।'

রেলের আইন মাফিক, অন্য যাত্রী পছন্দ না করলে মদ্যপান বারণ। কিন্তু যারা মদ্যপান করে, তারা সে-আইন বিশেষ মানে না। তা ছাড়া, মহিলাদের মদ্য বা ধূমপান আমার কাছে নতুন কিছু না। অস্বাভাবিকও না। আমি হেসে বললাম, 'আমার অপছন্দের কিছু নেই। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।'

মহুয়া গেলাসে চুমুক দিল। গেলাসটা রাখলো, দুই জানালার মাঝখানে টেবিলের ওপর। একটা ছোট ব্যাগ টেনে বের করলো বড় ব্যাগের কাছ

থেকে। ব্যাগের চেন খুলে তার ভিতর থেকে বের করলো সিগারেটের প্যাকেট আর গ্যাস লাইটার। সিগারেট ধরালো একটা। এই সময়ে দরজায় খট্ খট্ শব্দ হলো। সকলেরই দৃষ্টি গিয়ে পড়লো দরজার দিকে। অলকা আর মহুয়া ওদের গেলাস দুটো রাখলো টেবিলের ওপর জলের জাগের পিছনে। মিঃ গুপ্ত উঠে দরজা খুললেন। দেখা গেল ডাইনিং কারের বেয়ারা। সে বাংলাতেই জিজ্ঞেস করলো, 'স্যার আপনাদের খাবার এখনই দিচ্ছি।'

'আরো পরে দিলেও চলবে।' মিঃ গুপ্ত বললেন।

বেয়ারার চোখ পড়লো আমার ওপর। আমি ভাবতে পারি নি, এই রাত্রে খাবার পাওয়া যেতে পারে। আমি মোটামুটি খেয়েই বেরিয়েছিলাম। তবে আমি একটু বেশি রাত্রেই খেতে অভ্যস্ত। বেয়ারা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, খাবার চাই কি না। আমি বললাম, 'দু পিস্ বাটার টোস্ট আর এক কাপ কফি পেলেই চলবে।'

বেয়ারা ঘাড় ঝাঁকিয়ে চলে যেতেই রেলের টিকেট চেকার তাঁর লিস্ট নিয়ে ঢুকলেন। আমাদের সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নাসারন্ধ্র স্ফীত করলেন। বললেন, 'আপনাদের টিকিটগুলো একটু দেখাবেন।'

আমি ব্রিফকেস্ খুলে পার্স বের করলাম। রিজারভেশনের টিকেটসহ দুটো টিকিট বাড়িয়ে দিলাম। চেকার দেখলেন। লিস্টের সঙ্গে নাম মিলিয়ে পেন্সিল বুলিয়ে টিকেট ফিরিয়ে দিলেন। মিঃ গুপ্তর হাতে মহুয়া টিকেট দিল। মিঃ গুপ্ত দিলেন চেকারকে। চেকার যথারীতি লিস্টের সঙ্গে নাম মিলিয়ে, টিকেটগুলো চেক করে ফিরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেলেন। মিঃ গুপ্ত উঠে, দরজার লকটা আটকে দিলেন। তারপরে চললো তাঁদের পান। আমি চেষ্টা করলাম বইয়ে মনোনিবেশ করার।

দ্রব্যগুণ বলে একটা ব্যাপার আছে। পানের মাত্রা যতোই বাড়তে লাগলো,

তিনজনের আচরণও বদলাতে লাগলো। মহুয়ার সঙ্গে মিঃ গুপ্তর নিচু স্বরে কথা হচ্ছিল। আর মাঝে মাঝেই দুজনের উচ্চ হাসি কুপের ভিতরটাকে চমকে দিচ্ছিল। মহুয়া হাসতে হাসতে মিঃ গুপ্তর গায়ের ওপর ঢলে পড়ছিল। মিঃ গুপ্ত মহুয়ার গাল টিপে দিচ্ছিলেন।

আমি চোখ তুলে দেখবো না ভেবেও, চকিতের জন্য আমার দৃষ্টি সেদিকে চলে যাচ্ছিল। আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। স্বামী স্ত্রী হলেও, একজন বাইরের লোকের সামনে শালীনতার প্রশ্নটা থেকেই যায়। আমি তিন-জনের মদ্যপানে আপত্তির কোনো কারণ দেখি নি। কিন্তু ওরকম অশালীন আচরণও প্রত্যাশা করি নি। তা ছাড়া, অলকাকে মিঃ গুপ্তর আর এক-পাশে গায়ে গা ঠেকিয়ে বসতে দেখে, আমি মনে মনে অবাক না হয়ে পারি নি। অলকার কথাগুলোও আমার কানে ভালো লাগে নি। সে মিঃ গুপ্তর গায়ের ওপর পড়ে বললো, 'দুজনে কী বলছ আর মজা মারছ। আমাকে বাদ দিচ্ছ কেন?'

মিঃ গুপ্ত অলকার দিকে ফিরে বললেন, 'তোকে বাদ দিয়ে কখনো মজা মারতে পারি? আমরা অমিতার গল্প করছিলুম। অমিতা আর সেই প্রফুল্ল দে···।'

মিঃ গুপ্তর কথা শেষ না হতেই অলকা খিলখিল করে হেসে উঠলো। আর মহুয়ার মতোই মিঃ গুপ্তর গায়ে ঢলে পড়লো। তিনজনেই প্রায় গায়ে জড়াজড়ি করে কথা বলছে, হাসছে। তিনজনের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারটা আমার কাছে ক্রমেই কেমন রহস্যময় হয়ে উঠছে। তারপরে, মহুয়া এক-সময়ে আমার দিকে একবার দেখে বলে উঠলো, 'আমরা বড্ড বাড়াবাড়ি করছি। মিঃ ঘোষের নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে।'

'ঠিক বলেছো মহুয়া।' মিঃ গুপ্ত বললেন।

আমি কিছু বললাম না। বইয়ের দিকে চোখ রেখে, চুপ করে বসে রইলাম। আমি যে মিঃ ঘোষ, তা নিশ্চয়ই বাইরে বগীর গায়ে আটকানো লিস্ট

থেকেই দেখে নিয়েছিল। মহুয়া সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি এবার একটু জায়গা বদল করি। এক জায়গায় বসতে আর ভালো লাগছে না।'

আমি চোখ তুলে একবার তার দিকে দেখলাম। সে তখন মিঃ গুপ্তকে চোখের ইশারায় কিছু বলছিল। ভাবতে পারে নি, আমি মুখ তুলে তার দিকে তাকাতে পারি। মিঃ গুপ্তর দৃষ্টি পড়লো আমার দিকে। তাড়াতাড়ি বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার যেখানে খুশি বসো না। কে বারণ করছে?'

এক পলকের জন্য হলেও, আমি দেখলাম মহুয়ার আরক্ত চোখে মুখে মদির হাসি। বুকের আঁচল সরে গিয়েছে অনেকখানি। কোনোরকমে কাঁধ ছুঁয়ে আছে। নাভির নিচে তার শাড়ির বাঁধন। কাঁচুলির মতো সামান্য জামায় তার শরীরের অধিকাংশই যেন উন্মুক্ত। সে আমার আসনে এসে বসলো। এবং জানালার দিকে না গিয়ে, অনেকটা আমার কাছাকাছি বসে, গেলাসে চুমুক দিল।

এই সময়ে দরজায় ঠকঠক শব্দ হলো। আমিই উঠে দাঁড়ালাম। দরজা খুলে দেখলাম বেয়ারা দু হাতে অনেকগুলো খাবার নিয়ে এসেছে। আমি সরে দাঁড়াতে, সে ভিতরে ঢুকে একটু যেন থমকে গেল। মহুয়া তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপর জলের জাগ, হুইস্কির বোতল সরিয়ে দিল। বেয়ারা তিন জনের ঢাকা দেওয়া খাবার টেবিলের ওপর বসিয়ে দিল। বললো, 'আমি জলের বোতল আর ওই সাহেবের খাবার নিয়ে আসছি। দরজা বন্ধ করবেন না।'

সে বেরিয়ে গেল। এবং এক মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরে এলো। আমার বাটার টোস্ট আর কফির ট্রে, সিটের পাশে খাবার জায়গায় রাখলো। চারটে বোতল ছিল ট্রে-র ওপরেই। তিনটি বোতল তুলে বড় টেবিলের ওপর রেখে, বেরিয়ে যাবার আগে বললো, 'আমি কাল সকালে এসে বাসনপত্র সব নিয়ে যাব। রাত্রে আর আসব না।'

সে যাবার আগে দরজাটা টেনে দিয়ে গেল। মহুয়া উঠে গিয়ে ভিতর থেকে লক করে দিল।

মিঃ গুপ্ত বললেন, 'খাবারটা খেয়ে নেওয়া যাক।'

আমি ডান দিকে ফিরে আমার খাবারের দিকে মনোযোগ দিলাম। মাখন টোস্ট বেশ গরমই ছিল। কফিপট থেকে কাপে কফি ঢেলে নিয়ে, একটু চিনি মিশিয়ে নিলাম। চা, কফি, কোনোটাই আমি দুধ মিশিয়ে খেতে পারি না।

'মিঃ ঘোষ, আমাদের অনেক খাবার অর্ডার দেওয়া হয়েছে।' মহুয়া বললো, 'আপনাকে একটু চিকেন আর ফিশফ্রাই দিই।'

আমি আপত্তি করে বললাম, 'না না, আমাকে কিছু দেবেন না। আমি বাড়ি থেকে খেয়েই বেরিয়েছি। এই টোস্ট আর কফিই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

মহুয়া তখন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বললো, 'একটু ফিশ ফ্রাই আপনাকে নিতেই হবে।'

আমি কিছু বলবার আগেই মহুয়া একটি ফিশ ফ্রাই আমার প্লেটে দিয়ে দিল। আর ঝুঁকে পড়লো আমার ঘাড়ের ওপর। যেন চলন্ত ট্রেনে টাল সামলাতে না পেরেই ওর শরীরের ধাক্কা লাগলো আমার শরীরে। আমার কাঁধে হাত রেখে নিজেকে পতন থেকে বাঁচালো। বললো, 'সরি মিঃ ঘোষ।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' আমি ভদ্রতা করে বললাম।

মহুয়া সরে গেল। অলকা তখন মিঃ গুপ্তকে খাবার এগিয়ে দিচ্ছে। মিঃ গুপ্ত বললেন, 'মহুয়া, মিঃ ঘোষকে কিছু দিয়েছো?'

'দিয়েছি।' মহুয়া বললো, 'এবার তুমি খেয়ে নাও। অলকা, আয় তুই আর আমিও খেয়ে নিই।'

অলকা বললো, 'দাঁড়া, আগে মালটা শেষ করি।'

আমার কানে কথাটা খট্ করে বাজল। অলকার উচ্চারণ আর বলার ভঙ্গিটা এতই খারাপ, কোনো ভদ্রমহিলার পক্ষে সেটা একান্ত অসম্ভব মনে

হলো। মহুয়া বলে উঠলো, 'আঃ, আজে বাজে কথা বলছিস কেন?' মহুয়ার এই আপত্তি কতোটা খাঁটি, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। নেশাটা তার আর গোলাপী নেই। ঘোরটা আরও বেশি। তবুও অলকার কথাটা হয় তো ওর কানে বেজেছে, নিতান্ত আমার কথা ভেবেই। আমার মনে হলো, এরা সবাই, ওভাবে কথা বলতেই অভ্যস্ত। কিছুক্ষণ আগে মহুয়া মিঃ গুপ্তর সঙ্গে যে-আচরণ করছিল, সেটাও আদৌ শালীন ছিল না। এখনও অলকাও প্রায় সেই রকম আচরণই করছে মিঃ গুপ্তর সঙ্গে। মহুয়ার এদিকে সরে আসাটা কি একেবারে উদ্দেশ্যহীন? সব মিলিয়ে আমার মনে নানা অবাক জিজ্ঞাসা।

আমি খাওয়া শেষ করে, ন্যাপকিনে হাত মুখ মুছলাম। সিগারেট ধরিয়ে দরজা খুলে বাইরে গেলাম। দরজাটা টেনে দিলাম। মনটা ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখনও গোটা রাত্রি, একটি পুরো দিন ও আর এক রাত্রি বাকি। সহযাত্রীরা আমার কাছে ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠছে। যাত্রীর তালিকায় যে পরিচয়ই লেখা থাকুক, তিন জনের পরস্পরের সম্পর্ক বুঝে ওঠা কঠিন। যদিও জানি, এসব নিয়ে ভেবে আমার কোনো লাভ নেই।

আমি ওপরের বার্থে শুয়েছিলাম। কূপের ভিতরের আলো নেভানো হয়েছিল। জ্বলছিল শুধু একটি নীল আলো। কিন্তু নীচে কী ঘটছিল, তা অনুমান করতে অসুবিধা হচ্ছিল না। মিঃ গুপ্ত যে ভদ্রলোক নয়, সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিল। এখন দেখছি সে একটি নির্লজ্জ পশু। আমি চোখ বুজে থাকলেও, আমার সামনেই ঘটছিল প্রবৃত্তির নগ্ন ব্যভিচার। তার মধ্যে অলকা মাতাল হয়ে মুখে যা আসছিল তাই বলছিল। মহুয়া তাকে থামাতে পারছিল না।

এক সময়ে আমাকে অবাক অসাড় করে দিয়ে অলকা বলে উঠলো, 'কেন, কী জন্য চুপ করব? আমরা বেশ্যা, তাই? আমরা তো কারোর সঙ্গে জোর করে শুতে যাচ্ছি নে।'

গুপ্ত বোধহয় অলকার মুখ চাপা দিয়ে বললো, 'চুপ কর।'

'মিঃ ঘোষ কি জেগে আছেন?' মহুয়ার গলা শোনা গেল।

এখন জেগে থাকার মতো অন্যায় আর কিছু নেই। আমি মৃতবৎ পড়ে রইলাম। রাত্রের ট্রেন ছুটে চলেছে বাইরের অন্ধকারে।